মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় ঃ
কারণ ও প্রতিকার

الهزيمة النفسية عند المسلمين

মূল ঃ ড. আব্দুল্লাহ আল-খাতির
تأليف: د. عبد الله الخاطر رحمه الله

অনুবাদ ঃ মুফতী কিফায়াতুল্লাহ
ترجمة: مفتي محمد كفاية الله

সম্পাদনা ঃ আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুররহমান
مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

2011 - 1432
IslamHouse.com

সূচীপত্র :

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد.

কোন মহান আদর্শের সফল বাস্তবায়ন, কোন জাতির পুনর্গঠন ও তার সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনে যে পরিমাণ বৈষায়িক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসিক শক্তির। যে জাতির কাছে প্রয়োজনীয় সকল বৈষয়িক উপকরণ বিদ্যমান, কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প, অটল সিদ্ধান্ত ও অপরাজেয় মনোবল নেই, সভ্যতার সংঘাত ও আদর্শিক সংগ্রামে কুপোকাতই তাদের ললাট লিখন। পক্ষান্তরে যে জাতির বৈষয়িক আসবাবের যথেষ্ট অভাব রয়েছে বটে, কিন্তু সাহস- মনোবলে কোনরূপ ঘাটতি নেই, কালের ইতিহাসে তারাই বিজয়ী, তারাই শ্রেষ্ঠ। প্রথম যুগের মুসলিমদের কৃতিত্ব গাঁথা সোনালী ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শীর্ণ বদন, জীর্ণ বসন, উদরশূন্য মুসলিম পক্ষ। পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র নেই। অথচ প্রতিপক্ষ সব ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত। সৈন্য সংখ্যায়ও মুসলিমদের কয়েকগুণ। তথাপি বিজয়ের বরমাল্য মুসলিমদের কণ্ঠলগ্ন হয়। যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে ঈমান, তাওয়াক্কুল, দৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের অদম্য স্পৃহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিলনা। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের দুরন্ত সাহস, আকাশ ছোঁয়া মনোবলের সামনে সকল বাতিল পরাশক্তি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। ফলে কুফর-শিরকের নিশ্চিদ্র আঁধার চিরে উদিত হয় ইসলামের দীপ্ত সূর্য। বর্বরতা ও পাশবিকতার ধ্বংসস্তুপের উপর নির্মিত হয় মানবতার নতুন মিনার। কায়েম হয় আল্লাহর দ্বীন, মুক্ত হয় মানবতা, প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়- ইনসাফ, উচু হয় আল্লাহর কালেমা।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মাত্র চৌদ্দটি শতকের ব্যবধানে অনুসারীদের গাফলতির কারণে ইসলামের আলো নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। এত কালের বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতি ঈমান-আমলের দুর্বলতা, কর্ম বিমুখতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক কলঙ্কময় ইতিহাস

রচনা করে চলছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের সোনালী ইতিহাস, হারিয়ে ফেলেছে গৌরবময় ঐতিহ্য, খুইয়ে ফেলেছে আকাশ ছোঁয়া মনোবল, দৃঢ়চেতা মন ও সতেজ ঈমান। হতাশা ও আত্মবিস্মৃতি আজ পুরো জাতিকে অবশ করে দিয়েছে। এক সময়কার সিংহ-শার্দূলের এখন আকৃতিই অবশিষ্ট রয়েছে- প্রকৃতি নেই; দেহটাই আছে, আত্মা নেই। দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয় কেতন ওড়ানোর মহৎ উদ্যোগ তাদের নেই। নেই তাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কোন শুভ চিন্তা। অধিকন্তু বেশীরভাগ মুসলিমই ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিয়ে দারুন সন্দিহান ও চরম হতাশ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা যেন এ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এ যুগ ফিৎনা-ফাসাদের যুগ, মুসলিমদের পতনের যুগ, ইমাম মাহদি বা ঈসার (আঃ) আগমনের পূর্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়..।" অথচ এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়, যার প্রথমাংশ ভাল, নাকি শেষাংশ ভাল তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না"। এ হাদীস স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, উম্মতের যে কোন অংশই ভাল হতে পারে। যে কোন যুগেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। আল্লাহর বিধি-লিপির এমন কোন সিদ্ধান্ত আমাদের জানানো হয়নি যে, কল্যাণ ও বিজয় কেবল প্রথম যুগের মুসলিমদের জন্যই, শেষ যুগের মুসলিমদের কপালে কেবল অবনতি আর পরাজয়। বরং আল্লাহর অমোঘ ঘোষণা হল, "তোমরাই জয়ী হতে যদি তোমরা মু'মিন হও'। আল্লাহ তাআলার এ চিরন্তন ঘোষনা সর্বকালের জন্য. সর্বযুগের মু'মিনদের জন্য। সুতরাং এখনো যদি আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত 'মু'মিন' প্রমাণ করতে পারি, তাহলে বিজয় অবশ্যই আমাদের পদ চুম্বন করবে।

বস্তুত ঃ বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে অবনতি ও অধঃপতন আমরা অবলোকন করছি- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয়ের যে করুণ চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি, মূলতঃ তা আমাদের ঈমানী দুর্বলতা, হীনমন্যতা, হতাশা, সংশয় সন্দেহ তথা মানসিক বিপর্যয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। নচেৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের চেয়ে আমাদের বাহ্যিক শক্তি-উপকরণ বহু গুনে বেশী। আমাদের রয়েছে ৫৭টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, ১৪০ কোটি জনগণ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিশ্বের শতকরা পচাত্তর ভাগ

তেল সম্পদ, যার উপর নির্ভর করে আধুনিক বিশ্ব চরম উৎকর্ষতা লাভ করছে। তা সত্ত্বেও আমাদের এ চরম বিপর্যয়ের কী কারণ থাকতে পারে? উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এতগুলো বাহ্যিক উপকরণের সাথে যদি আমরা সহীহ ঈমান, বিশুদ্ধ আমল, পূর্ণ একীন ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতাম; হতাশা, হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হতাম। কাজেই এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন হতাশা, হীনমন্যতা ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ও লক্ষণ চিহ্নিত করে এমন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে আমরা মরণ ব্যাধি এ মানসিক বিপর্যয় উত্তরণ করে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করার মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করতে পারি।

অত্র পুস্তিকাটিতে মুসলিম উম্মাহর বিরাজমান মানসিক বিপর্যয় এবং তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। এটি الهزيمة النفسية عند المسلمين নামে আরবী পুস্তিকার অনূদিত বাংলা রূপ। সৌদি আরবের দাম্মামের অধিবাসী প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আল মুনতাদা আল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ড. আব্দুল্লাহ আল-খাতির বিরচিত গবেষণাধর্মী পুস্তিকাটি মূলত ঃ একটি ভাষণ। লন্ডনের এক সেমিনারে তিনি এ গবেষণামূলক ভাষনটি উপস্থাপন করেন। এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে লেখকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার সুস্পষ্ট ছাপ বিরাজমান। কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেনে। বলা যায়, বইটি একজন বিজ্ঞ হাকীমের মূল্যবান ব্যবস্থাপত্র- যা অনুসরণ করলে দুরারোগ্য ব্যাধি- মানসিক বিপর্যয়, হাতাশা ও হীনমন্যতা সহজেই উপশম করা যাবে।

লেখালেখির জগতে অনুবাদকের যোগ্যতা 'তিফলে মকতব' বা বাল্য শিক্ষার্থীর পর্যায়ে। তথাপি বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুবাদের ন্যায় একটি কঠিন কাজে হাত দেয়ার দুঃসাহসকিতা দেখানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক তরজমার দুর্গম পথ পরিহার করে ভাবানুবাদের মানসিক বিপর্যয় কেটে উঠতে সামান্য ভূমিকা রাখলেও অনুবাদ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন মুসলিম উম্মাহর উপর করুণার বারি বর্ষণ করেন, যেন তারা ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করতে পারে দিগ-দিগন্তে এবং সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে সক্ষম হয় মানবতার মুক্তি সাধন করতে। আরও প্রার্থনা করছি- মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণে যে যেভাবে মেহনত করে চলছেন, তিনি যেন সবার প্রচেষ্টা ও মেহনতকে গ্রহণ করেন। সেই সাথে এ নগন্য অনুবাদকের ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। আমীন!!

কিফায়াতুল্লাহ
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহ তা'আলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।

"আল হাযীমাতুন্নাফসিয়্যাহ ইনদাল মুসলিমীন" বা মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় বইখানি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আল-মুনতাদা আল ইসলামীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. আব্দুল্লাহ খাতির (রহ.) এর দ্বিতীয় পুস্তক। মুলতঃ এটি একটি ভাষন, যা তিনি বৃটেনে প্রদান করেছিলেন।

অতীতে বহু যুগ ধরে লক্ষ্য করা গেছে যে, মুসলিম জাতি চিন্তা-চেতনায়, শক্তি-সামর্থে ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে এ বিপর্যয় আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এ বিষয়টির আলোচনা খুবই গুরুত্বের দাবীদার।

আজকের মুসলিম জাতি প্রকাশ্যেই তাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা মুনাফিকীর জীবন বেছে নিয়েছে। তারা সত্যিকার মুসলিমদের সাথেও নয়, আবার পুরাপুরি ইসলামের শত্রুদের সাথেও নয়, বরং এর মাঝামাঝি একটা পথ ইখতিয়ার করেছে, যার চিন্তা- চেতনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য একেবারে অস্পষ্ট। তারা আজ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেও কোন অগ্রগতি বা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে শুধু পিছিয়ে পড়েছে। এটাই হল প্রকৃত বিপর্যয়। যে ব্যক্তি নিজের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে, হোক তা সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিকূল, তার আদর্শের পতাকা শত প্রতিবন্ধকতায়ও সমুন্নত রেখেছে। সেই পারে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কুরবানী করতে, ত্যাগ স্বীকার করতে।

আর যে ব্যক্তি নিজের আদর্শে অটল নয়, সামাজিক আবহাওয়ায় যার আদর্শ বারবার বদলে যায় সে কিছুই করতে পারেনা। পারে শুধু নিজের সাথে প্রতারণা করতে। এটাও মানসিক বিপর্যয়। মহান রাব্বুল আলামীন যেন এদের সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

অর্থঃ এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোকা দিতে চায়। তারা শুধু নিজেদেরই প্রতারিত করে। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যাচারে লিপ্ত। (সুরা- আলবাকারা : ৮-১০)

যারা এ রকম দোটানায় ভোগে তারা কোন ভাল পন্থা বেছে নিতে সক্ষম হয় না। তাই তারা একটা বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তহীনতার জীবন যাপন করে। কারণ তাদের কাছে থাকে না সত্যের মাপকাঠি, যার মাধ্যমে সবকিছুকে সুসংগঠিত করতে পারে। আর এটাই হচ্ছে জীবন পরিচালনায় উত্তম পন্থা নির্ধারণে প্রথম সিদ্ধান্ত। অতএব মুনাফিক, আরামপ্রিয় ও প্রতারকরা এমনভাবে কাজ করে যাতে তাদের সঠিক পরিচয় ফুটে না উঠে এবং যাতে তারা ঝামেলামুক্ত জীবন যাপন করতে পারে, যদিও তাতে ক্ষতিপূরণ ও যথেষ্ট মূল্য দিতে হোক না কেন। তাদের মান সম্মান ও মানবাধিকার ছিনিয়ে নেয়া হোক না কেন, তারপরও তারা ভোগ বিলাসিতায় ব্যস্ত থাকতে চায়। অতএব কোথায় তাদের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত ও উত্তম পন্থা? ফলে তারা কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। পারে না দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কিংবা প্রস্তুতি নিতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُّ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত তাহলে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং বলা হল, বসা থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (সূরা তাওবা : ৪৬)

তাদের আর একটি খাছলত হল, তারা ইসলামের নামে নিজেদের নামকরণ করতে চায়। তাদের পরিচয় বহন করে নিজেদের মুসলিম হিসাবে জাহির করে। আর এগুলো করে নিজেদের স্বার্থের জন্য। একই সময় তারা মনের পাশবিক চাহিদা মিটায় এবং জুলুম-অত্যাচার ও দুর্নীতিগ্রস্ত জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে। ফলে তারা কোন সংকট সংঘর্ষের মুখোমুখী হবার সাহস ও সামর্থ হারিয়ে ফেলে। তখন তারা সঠিক পথ গ্রহণ করবে নাকি ভ্রান্ত পথ, এ নিয়ে মতদ্বৈততায় ভোগে। এটাও একটি মানসিক বিপর্যয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

.

"যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা বিদ্রুপ ও প্রহসন করে থাকি।" (সূরা বাকারা : ২:১৪ আয়াত)

আসলে এ ধরণের লোকেরা সবচেয়ে বেশী মানসিক বিপর্যয়ে ভোগে। আর এরাই যে কোন বিপদ-সংকটের মুখোমুখী হতে ভয় পায়। তারা আরও ভয় পায় সেগুলো অবলোকন করতে, স্বীকার করতে, ভূমিকা নিতে এবং সুসংগঠিত করতে। এটি হচ্ছে আর একটি মানসিক বিপর্যয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলবে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি বলে দাও ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাশা করছ? (সূরা তাওবা : ৬৫)

লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশী মানসিক বিপর্যস্ত ঐ ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত লক্ষ্য ছাড়া চেষ্টা করে। তবে ঐ ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে কোন শিক্ষনীয় নেই যা পরিশ্রমী ও অপরিশ্রমী এবং মুজাহিদ ও অমুজাহিদরা সমানভাবে করে থাকে। বরং ঐসব লক্ষ্য ও উদ্দেশের মাধ্যমে শিক্ষনীয় রয়েছে যা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতএব যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং যারা বসে থাকে তাদের সকলের যদিও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর ইবাদত করা, কিন্তু মুজাহিদগণ তাদের জিহাদের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, দীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর, যাতে কোন ফিতনা থাকবে না। ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপর্যয় আর হতে পারে না যে ব্যক্তি কাজ করে ও জিহাদ করে- কিন্তু তা এজন্য নয় যে, দীন সম্পূর্ণই আল্লাহর জন্য হোক, বরং দীনকে ধ্বংস করার জন্য এবং ফিতনা সৃষ্টির জন্য। আর এটাই সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেয়, যার কারণে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা এবং উৎকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। এবং সে সংকটের মুখোমুখি হতে অক্ষম। অতএব এমন ব্যক্তির চেয়ে কঠিন মানসিক বিপর্যয়পূর্ণ আর কাউকে পাবেনা।

আজকের এ সময়ে এ ধরণের মানসিক বিপর্যয়ের শিকার মুসলিম উম্মাহ। আর এ সকল বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন ড. আব্দুল্লাহ খাতির।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাকে তার এ মহান প্রচেষ্টার পুরস্কার দান করুন। আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান কারুন।

তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও প্রার্থনা কবুলকারী। সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি নাযিল হোক।

ড. আব্দুর রায্যাক মাহমূদ ইয়াসীন আল হামদ
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল বিভাগ
বাদশহ সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়,
রিয়া, সৌদী আরব।
তাং-১২-১০-১৪১১ হিজরী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

অদ্যকার এ মহতী সম্মেলনে হাজির হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দ উপলব্ধি করছি। কারণ এ সম্মেলন উপলক্ষে আমি সাক্ষাত পেয়েছি তারুণ্যদীপ্ত এমন এক যুব সম্প্রদায়ের, যারা ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত। যাদের আকাংখা সীমাহীন, উৎসাহ ক্লান্তিহীন এবং অফুরন্ত যাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য।

অতএব আমি বলব, আজকের এ সম্মেলন ঐ সকল তরুণদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের আমলের পরিবর্তন করে।

এ সম্মেলন সে সব তরুণদের জন্য, যারা সব সময় ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী, হতাশাবাদীদের হতাশা যাদের কখনো নিরাশ করে না।

আজকের এ সম্মেলন এমন এক যুব সম্প্রদায়ের জন্য, যারা একটি পরিবর্তন ও সফল বিপ্লবের প্রত্যাশা করে। যদিও এ ক্ষেত্রে তারা এমন এক প্রবীন সম্প্রদায়ের বাধার সম্মুখীন হয়, যারা নিজেদের অলসতা, পশ্চাৎপদতা, পরাজয় বরণকে কৌশল তথা বিচক্ষনতা, দূরদর্শীতা ও বুদ্ধিমত্তার কাজ বলে বৈধতা দানের প্রয়াস চালায়। তারা নিজেরা তো পরাজয় বরণ করেই নিয়েছে, এখন অন্যদের ললাটেও পরাজয়ের কালিমা লেপনের চেষ্টায় লিপ্ত।

আজকের সম্মেলন তাদের জন্য, যারা জানে যে, হাজার মাইলের পথ-পরিক্রমণও প্রথমতঃ এক পা দিয়েই শুরু হয়।

অদ্যকার এ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে "মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় ও তার প্রতিকার"। আমার মতে বাক্যটিকে এত ব্যাপকভাবে না বলে এভাবে বলা উচিত "অধিকাংশ মুসলিমের মানসিক বিপর্যয়...। সকল মুসলিমের উপর মানসিক বিপর্যয়ের দোষ চাপিয়ে দেয়াকে আমি সমীচীন মনে করি না। কারণ, হাদীসের ভাষ্য মতে উম্মাতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিশেষ জামাআত সর্বদা হক্বের উপর অটল থাকবে। বিপক্ষ শক্তি তাদের কোন প্রকার

ক্ষতি করতে পারবে না। এতে বুঝা যায়, এ দলটি কখনো মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হবে না।

আমি এখানে আপনাদেরকে হতাশ করে দিতে উপাস্থিত হইনি যে, শুধুমাত্র দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিমদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হব, বরং একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও মুসলিমদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে মানসিক ব্যাধিগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিবিধান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। আর এজন্যই আমি এখানে উপস্থি হয়েছি।

এই যে একটি ব্যাধি-যে ব্যাধিতে আজ অধিকাংশ মুসলিম আক্রান্ত এর যেমন কিছু লক্ষণ ও কারণ রয়েছে তেমনি রয়েছে তার প্রতিকার ব্যবস্থা। আমি আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে পাশ্চাত্যের পদ্ধতি বর্জন করে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ ব্যাধির লক্ষণ ও কারণ চিহ্নিত করতঃ তার সুষ্ঠু চিকিৎসার সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!!

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণসমূহ

প্রথম লক্ষণ ঃ

মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশা

আজ অনেক মুসলিমই এতে আক্রান্ত। এদের যে কারো সাথে মুসলিমদের বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলে বুঝা যায়, তারা মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছেন, ভাবছেন এ দুরবস্থা হতে মুসলিমদের মুক্তির কোন উপায় নেই। অধিকন্তু তারা এর সাথে সামঞ্জস্যশীল দু' একটি বাগধারা বা উদাহরণ পেশ করে তা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। যেমন তারা বলেন, মুসলিমদের এ অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নিছক 'অরণ্যে রোদন' ছাড়া কিছুই নয়। কেউ আবার বলেন, এ প্রচেষ্টা ফুটো বেলুনে ফুঁক দেয়ার মতই। ফুটো বেলুনে ফুঁক দিয়ে যেমন কোন ফায়দা নেই, তেমনি মুসলিমদের বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই।

কতিপয় মুসলিমের এ ধরনের উক্তি উদ্যমীদেরকে হতাশ করে দেয়। যারা একটি বিপ্লবের প্রত্যাশা করে, যারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চায়, তাদেরকে নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে।

উপরোক্ত মনোভাব যাদের মাঝেই রয়েছে, বুঝতে হবে তারা নিশ্চিতভাবে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার। এদের অনেকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী এবং বড় আলেমও রয়েছেন। আপনি তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করেন, ধর্মজ্ঞানহীন বা ধর্ম-বিমুখ মুসলিমদের দ্বীনি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করছেন না কেন? উত্তরে তিনি এ বলে দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করবেন যে, কে আছে তোমার পাশে? কে তোমার নছিহত গ্রহণ করবে? কেউতো তোমার কথা শুনতে আগ্রহী নয়। বস্তুতঃ এ ধরনের ব্যক্তি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং পতনের দ্বার প্রান্তে উপনীত। তাই তারা এধরনের উক্তি করে থাকে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হীনমানসিকতার একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বলেছেন ঃ

إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم– أو بالضم– فهو أهلكهم.

অর্থ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে মূলতঃ সেই তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করল। অন্য বর্ণনা মতে, সে'ই মুলতঃ ধ্বংসে নিপতিত (মুসলিম : ২/৩২৯)

প্রথম বর্ণনায় أهلكهم বা "সেই তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করল"- এর ব্যাখ্যা হলো, "সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে" বলার দ্বারাই যেন সে তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করল। কারণ সবাই তো আর এমনটি নয়। আত্মপ্রত্যয়ী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎ সাহসী লোক পৃথিবীতে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু হতাশাগ্রস্তদের এ ধরণের উক্তি আশাবাদীদের উৎসাহ, উদ্দীপনায় ভাটার সৃষ্টি করে।

আর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে أهلكهم বা "সে'ই ধ্বংসে নিপতিত" এর ব্যাখ্যা হলো, কোন ব্যক্তি যখন মনে করবে যে, মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেছে, সবাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এখন তাদের পরিশুদ্ধির কোন পথ নেই, এদের উদ্ধারে মেহনত করা ও শ্রম দেয়া একেবারেই বৃথা, তাহলে বুঝতে হবে সে নিজেই ভ্রান্তিতে নিপতিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এ ধরনের বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত করে দিয়েছে। এই হীনমানসিকতা আজ বহু মুসলিমকে গ্রাস করে নিয়েছে। 'লোকে শুনবে না' এ দোহাই দিয়ে দিয়ে তারা অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। ফলে তারা হীনমন্যতায় ভোগে এবং সর্বদা হতাশায় নিমজ্জিত থাকে। পরিণতিতে তারা দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার বা সত্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের মহা দায়িত্ব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় লক্ষণ ঃ

বিপর্যস্ত অবস্থার উপর আত্মসন্তোষ

আপনি এক শ্রেণীর লোকদের দেখবেন, যারা জ্ঞানে গুনে ও সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি বেশী লক্ষ্য করে। অথচ এসব বিষয়ে সব সময় নিজেদের চেয়ে অগ্রগামীদের প্রতিই লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু তারা তা না করে নিজেদের অবস্থার উপর পরিতুষ্ট থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। দ্বীনের ক্ষেত্রে সীমাহীন দূরাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সাফাই গেয়ে এই বলে নির্দোষ হতে চায়, আরে! আমরাতো অনেকের চেয়ে ভালই আছি। এগিয়ে আছি।

তৃতীয় লক্ষণ ঃ

সৃজনশীল মানসিকতা বর্জন ও পরনির্ভরশীল জীবন যাপন

মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ আবিস্কার, উদ্ভাবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারাও যে আবিস্কারক ও উদ্ভাবক হতে পারে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে, তা যেন তারা কল্পনাও করে না। ফলে তাদেরকে সর্বদা অন্যের করুণা নির্ভর হয়েই থাকতে হয়। বহু মুসলিম দেশ আজ এ রোগে আক্রান্ত। তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসটি পর্যন্ত নিজেরা তৈরী করতে পারে না। সবকিছুই তারা অন্যদেশ থেকে আমদানী করে থাকে। ফলে এসব দেশকে সব সময় অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয়।

বস্তুত ঃ এটাও এক ধরণের মানসিক দূর্বলতা এবং নিজেদের শক্তির বিপুল ভান্ডার সম্পর্কে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

চতুর্থ লক্ষণ ঃ

বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

এই লক্ষণটি এক শ্রেণীর মুসলিমদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে লেখা-পড়া করতে যায় এবং সে সব দেশের শিক্ষা- সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। বিজাতীয় সভ্যতায় প্রভাবিত হওয়াটাই ঐ লোকগুলোর বিপর্যস্ত মানসিকতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তারা ভাল মন্দের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনি। বিজাতিদের জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তাদের তথাকথিত সভ্যতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণে তারা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সব কিছুই তারা গ্রহণ করে স্বদেশে আমদানী করে।

বস্তুত ঃ পাশ্চাত্য জগত যান্ত্রিক দিক দিয়ে উৎকর্ষ সাধন করলেও নৈতিকতা ও মানবিকতার ক্ষেত্রে তারা একেবারেই পিছিয়ে। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির যে চিত্র আমরা অবলোকন করছি, তা নিতান্তই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর।

কিন্তু যদি তাদের মানবিকতা ও নৈতিকতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি ও সার্বিক জীবন প্রণালীর প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

এক কথায় বিজাতিদের উন্নতি ও অগ্রগতি কেবল যান্ত্রিক সভ্যতার, মানবিক সভ্যতার নয়। পক্ষান্তরে আমাদের রয়েছে একটি পরিপূর্ণ দ্বীন, যার আদলে জীবন গড়ার মাধ্যমে আমরা মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা কারো মুখাপেক্ষী নই। হ্যাঁ, প্রয়োজনে যান্ত্রিক বিষয়ের জ্ঞান তাদের কাছ থেকে নিয়ে তা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করতে পারি।

পঞ্চম লক্ষণ ঃ

নতজানুমূলক নীতি গ্রহণ

রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে আজ মুসলিমদের আত্মসমর্পনমূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় যা মানসিক বিপর্যয়ের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফলে দেখা যায় যে, কোন চুক্তি বা সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নতজানুমূলক চুক্তি অথবা প্রাপ্যের অর্ধাংশ বা কিয়দাংশের উপরও চুক্তি করতে লজ্জাবোধ করে না। যেমন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই বলে থাকে যে, 'ইসরাইল রাষ্ট্র এখন বাস্তব সত্য। তাদের সাথে এখন আমাদের মিলে মিশেই থাকা উচিত।'

বস্তুত ঃ তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার কারণে শত্রুর উপর প্রাধান্য বিস্তারের সৎ সহস হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণে তারা এ ধরণের মনোবৃত্তি পোষণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

"তোমরা হীবনল হয়োনা, চিন্তা করোনা। তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।" (আলে ইমরান : ১৩৯)

প্রকৃত মু'মিন হয়ে জয়ী হওয়ার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য তারা আজ হারিয়ে ফেলেছে। এ কারণেই ফিলিস্তিন প্রেক্ষাপটে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তা বরণ করে নিয়েছে। অথচ তাদের কর্তব্য ছিল ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবার আক্রমণ করা এবং তাদের যাবতীয় ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আরও দুঃখজনক বিষয় হল, কতিপয় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য ও বিবৃতিতে উক্ত বিষয়ের প্রতি নীরব সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। তারা এই দুরবস্থার পরিবর্তনের দিক-নির্দেশনা দেয়ার পরিবর্তে সাফাইমূলক বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। এটাও বিপর্যস্ত ও দুর্বল মানসিকতার পরিচায়ক।

ষষ্ট লক্ষণ ঃ

ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশে সংকোচবোধ

এই লক্ষণটি মুসলিম যুব সমাজের মাঝে বেশী দেখা যায়। তাদের মধ্যে এই প্রবণতা এতই বেশী যে, তারা হালালকে হালাল, আর হারামকে হারাম বলতেও সংকোচবোধ করে। বিশেষ করে যখন তারা কোন অমুসলিমের মুখোমুখি হয়,আর তাকে কোন হারাম জিনিস অফার করা হয়, কিংবা কোন হারাম কাজের প্রতি আহ্বান করা হয় তখন তা 'নো, থ্যাংকস' অথবা এ জাতীয় কিছু বলেই ক্ষান্ত হয়। তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করে এ কথা বলতে নারাজ যে, 'আমি মুসলিম, আমার ধর্মে এটা হারাম ও গর্হিত কাজ।'

আবার অনেকে এমনও রয়েছে, যারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পায় এই আশংকায় যে, তাকে 'গোড়া' 'সাম্প্রদায়িক' 'চরমপন্থী' 'মৌলবাদী'

(Fundamentalist) প্রভৃতি বলে কটাক্ষ করা হবে। এ পর্যুদস্ত মানসিকতা আরও স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে কতিপয় মুসলিমের পোশাক-পরিচ্ছদে। তারা যখন কোন অমুসলিম রাষ্ট্র সফর করে তখন তারা ইসলামের পরিচয়বহী পোশাক পরিত্যাগ করে বিজাতীয় বেশ-ভূষা অবলম্বন করে। এমন কি তারা খৃষ্টানদের জাতীয়তার প্রতীক 'টাই' ব্যবহার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এরা বিজাতিদের সব কিছু অবলীলায় গ্রহণ করতে যেন আনন্দ বোধ করে। পশ্চিমাদের মন জয় করতে এরা সর্বক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি গ্রহণ করে "নব্য ইউরোপিয়ান" সাজতে চায়। ইসলাম অনুমোদিত পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাহযীব-তামদ্দুনের প্রতি এদের কোন আকর্ষণ নেই। এ জন্য এরা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি মোতাবেক জীবন যাপন করাকে অপমানকর মনে করে। এটা তাদের দুর্বল মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

পক্ষান্তরে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম নয়, বরং অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, নতুন ও তার হুকুম আহকাম, শরয়ী অনুশাসন পালনে তাদের নিষ্ঠা এবং ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের প্রতি আকর্ষণ রীতিমত বিস্ময়কর।

একজন ইংরেজ নব-মুসলিমের ঘটনাই শুনুন, যিনি ইসলামী পরিচয় প্রকাশে মোটেও কুণ্ঠিত হননি, বরং ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করাকে তিনি গর্বের বিষয় মনে করেছিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের তিন সপ্তাহ পর অন্য এক শহরে চাকুরীর সন্ধান পেয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। এদিকে স্থানীয় একটি ইসলামী যুব কল্যাণ সংস্থার লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ দিতে চেয়েছিল যে, তিনি যেন ইন্টারভিউ কালে ইসলাম গ্রহণের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ না করেন, যাতে বিষয়টি চাকুরীতে অমনোনীত হওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ তারা আশংকা করছিল যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে চাকুরীতে অমনোনীত হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে নতুন ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। ততক্ষণে তিনি ইন্টারভিউ দিতে চলে গেছেন।

সেখানে তিনি আরো অনেক অমুসলিম লোকের দেখা পেলেন, যারা একই পদে চাকুরী প্রার্থী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন তার ইন্টারভিউ শুরু হল, তিনি কর্মকর্তাদের বলে দিলেন ঃ আমি স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছি, পূর্বে আমার নাম ছিল 'রোড' আর বর্তমান নাম হল 'উমার'। তিনি আরো বললেন, "আমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছি সেহতু আমাকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হলে অবশ্যই নামাযের সময় দিতে হবে।"

উক্ত নব-মুসলিম যুবকের ইসলামী পরিচয় প্রকাশ চাকুরীর পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতো করেইনি, বরং তা চুকুরীর জন্য সহায়ক হয়েছে। কারণ,

কর্মকর্তারা তাকে তৎক্ষণাৎ উক্ত পদের জন্য মনোনীত করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কর্মকর্তারা এই যুবকের ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো দেখায়নি, উপরন্তু তার এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলল, "আমরা এই পদের জন্য এমনই একজন ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম, যিনি সকল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। আর আপনার মাঝে আমাদের প্রত্যাশিত গুণটি পাওয়া গেল। কারণ আপনি চরম বৈরী পরিবেশে থেকেও স্বধর্ম ত্যাগ ও নাম পরিবর্তনের মত একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন, আপনাকে ধন্যবাদ।"

এই নব-মুসলিম তার ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করেছে স্বগর্বে। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সামাজিক সেই সব সংকীর্ণতা বর্জন করে, যা আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আমরা সে সব আল্লাহদ্রোহী ও হীনমন্য মুসলিমদের জন্য হিসাব কষি, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে চায় না। আমরা তাদের সাথে মাঝামাঝি ধরনের একটি সমঝোতায়ও আসতে চেষ্টা করি যেন তারা বুঝতে না পারে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমরা আপোষহীন এবং নামায রোযার প্রতি যত্নশীল।

বস্তুতঃ মানসিক পরাজয়টা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়, যা মানুষের পরিচয় ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে স্বগর্বে প্রকাশ করতে বাধা দেয়। যারা নতুন করে মুসলিম হয়, তারা পারিপার্শ্বিক কোন চাপ ছাড়াই দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয় এবং তা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হয়। ফলে তারা যে কোন প্রতিকুল পরিবেশে নিঃসংকোচে স্বীকার করেঃ "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আর এটা আমার ইসলামী পোশাক, সুতরাং তা পরিধান করতে আপত্তি কিসের?"

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, তারা যে কোন স্থানে ইসলামী পোশাক পরিধান করে থাকেন এবং এসব পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করেন। ধর্মীয় বিধানের প্রতি তাদের এই আগ্রহবোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা পুরোপুরি দ্বীন মেনে চলতে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণের অসংখ্য বিস্ময়কর কাহিনী থেকে একটি কাহিনী বর্ণনা করব, যা আমাদের অন্তঃচক্ষু খুলে দিবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল পারস্যের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ চলাকালে। এ যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতি ছিল রুস্তম, আর মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। মুসলিম বাহিনী যখন পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী হলো, তখন রুস্তম দূত মারফত মুসলিমদের আগমনের কারণ জানতে চাইল। জবাবে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এ দলের প্রধান ছিলেন রিবয়ী

ইবনে আমের (রা.) প্রতিনিধি দল রুস্তমের সভাকক্ষে পৌছলে রুস্তম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি?

রিবযী ইবনে আমের (রা.) বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর গোলামীর পথ দেখাতে, এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাঁর প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে।

এ কথা শুনে রুস্তমের মনোজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, কি দুর্ভাগ্য আমার! এই বিশাল সেনাবাহিনী যাতে কেবল গায়িকা আর বাবুর্চিই রয়েছে হাজার হাজার, অথচ এই লোকের (রিবযী ইবনে আমেরের) মত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একজন লোকও নেই।

রিবয়ী (রা.) এসেছেন একটি অখ্যাত দ্বীপ থেকে যাদেরকে বলা হয় মরুবাসী বেদুঈন। রুস্তমের সম্পদের জৌলুস ও নাগরিক সভ্যতার তুলনায় যাদের কোন সভ্যতাই নেই। এতদসত্ত্বেও রিবয়ী (রা.) রুস্তমকে বলেছেন, 'পার্থিব জীবনের সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা'র দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। রিবয়ী (রা.) কথাগুলো রুস্ত মের কাছে দুর্বোধ্যই মনে হলো। এজন্য তার ললাটে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা।

রিবয়ী ইবনে আমের (রা.) আরও বললেন, আমরা এসেছি ধর্ম নামের অধর্মগুলোর বর্বরতা হতে মানব জাতিকে মুক্ত করে ইনসাফপূর্ণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দ্বীন সহকারে বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছেন যে আমরা তাদেরকে দ্বীনের পথে আহ্বান করি। যারা এই দ্বীন গ্রহণ করবে, আমরা তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেব এবং কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই দেশে ফিরে যাব। আর যারা এই দাওয়াত প্রত্যাখান করবে, আমরা তাদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অর্জন করে ধন্য হব।

রুস্তম বলল ঃ তোমাদের আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি?

রিবয়ী (রা.) বললেন ঃ যারা যুদ্ধে মৃত্যুর সূধা পান করবে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখের চিরন্তন আবাস জান্নাত। আর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের রয়েছে অনিবার্য সফলতা ও গৌরবময় বিজয়।

রুস্তম বলল ঃ ঠিক আছে, তোমাদের বক্তব্য শুনলাম। এ ব্যাপারে কিছুদিন সময় চাই, যাতে আমরা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি। রিবয়ী (রা.) বললেন ঃ বেশ তো! আপনাদের ক'দিন সময় দরকার, একদিন না দু'দিন?

রুস্তম বলল ঃ দু-একদিন নয়, বরং আমাদের নেতৃবৃন্দ ও নীতি-নির্ধারকদের সাথে আলোচনা করা পর্যন্ত সময় দরকার।

রিবয়ী (রা.) বললেন ঃ দুশমনের মুখোমুখি অবস্থানকালে প্রতিপক্ষকে তিন দিনের অধিক সময় দেয়া আমাদের নবীজীর নীতি নয়। তিনি কথাগুলো বললেন জোরালো ভাষায় দীপ্ত কণ্ঠে।

রুস্তম এতে বিস্মিত হয়ে বলল ঃ আপনি কি তাদের নেতা?

রিবয়ী (রা.) বললেন ঃ না, আমি তাদের নেতা নই। কিন্তু সমগ্র মুসলিম জাতি অভিন্ন দেহের ন্যায়। তাদের সাধারণ ব্যক্তিও বিশেষ লোকদের অনুমোদন ছাড়াই যে কোন লোককে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এতে সবাই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

রুস্তম কথাবার্তায় আরও নমনীয় হয়ে গেল এবং সভাসদবৃন্দের পরামর্শ চাইল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, সে যেন পরাজয় বরণ করে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তার সভাসদবর্গ তাকে প্ররোচনা দিয়ে বলল, আপনি কি এ 'কুকুর' দের কাছে আপন ধর্ম ও মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দিবেন? ওদের পোশাকের দিকে চেয়ে দেখুন, ওরা কত নিকৃষ্ট!

রুস্তম বলল ঃ ধ্বংস হোক তোমাদের! পোষাকের দিকে দেখোনা, বরং তাদের চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা ও স্বভাব-চরিত্রের দিকে তাকাও। আরবরা খাদ্য-বস্ত্রকে তুচ্ছ মনে করে, কিন্তু তারা তাদের বংশীয় মর্যাদা রক্ষা করে।

সাহাবী রিবয়ী ইবনে আমের (রা.) এর বক্তব্য শুনে এই ছিল রুস্তমের প্রতিক্রিয়া। অথচ বর্তমানে আরবরা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তারা এখন পোশাকের প্রতিই গুরুত্ব দেয় বেশী। আর বংশের ব্যাপারে এতই শিথিলতা প্রদর্শন করে যে, অমুসলিম নারীদের সাথে সম্পর্ক করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। এ রকম আরও অনেক নিন্দনীয় কাজে তারা জড়িত। তারা বিভিন্ন রকমের ফ্যাশন ও বিনোদনের পিছনেই সময় কাটায় বেশী। সব সময় নতুন নতুন মডেলের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এদের পোশাক এখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত তথা ঋতু ভিত্তিক জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা এদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটাই বর্তমান আরবদের প্রকৃত রূপ।

রিবয়ী বিন আমের (রা.) এর ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের তাবলীগের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অসীম সাহসিকতা ও বুলন্দ হিম্মতের দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরা। ঐতিহাসিকগণ যেখানে রিবয়ী ইবনে আমের (রা.) এর এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন, সেখানে তারা এ কথাও লিখেছেন যে, মুসলিম প্রতিনিধি দলকে যাতে প্রভাবিত করা যায় এবং তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে পারসিকরা জৌলুসপূর্ণ বিশাল সভাকক্ষ তৈরী করে মেঝে ও আগমন পথে মূল্যবান গালিচা বিছিয়ে দেয় এবং আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করে। কিন্তু রিবয়ী

(রা.) এতে কোনরূপ প্রভাবিত না হয়ে হাতে খঞ্জর নিয়েই সভাকক্ষে প্রবেশ করতে লাগলেন।

প্রহরীরা বলল, আপনি খঞ্জর রেখে আসুন।

রিবয়ী ইবনে আমের (রা.) বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে আসিনি। আমি হয় এই হাতিয়ার নিয়েই প্রবেশ করব, নতুবা আমি স্ব-শিবিরে ফিরে যাব।

এ কথু শুনে প্রহরীরা খামোশ হয়ে গেল এবং সভাকক্ষে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ জানালো। পরে তিনি খঞ্জর ও সাওয়ারী নিয়েই রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন। তারা তাকে কাবু করার জন্য যে গালিচা বিছিয়েছিল, তা খঞ্জর দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মঞ্চে পৌঁছে সাওয়ারীটি রুস্তমের পাশেই বাঁধলেন।

তিনি তার এ আচরণে এ কথাই বুঝিয়ে দিলেন, আমার সাথে যা আছে, তা সহকারেই আমাকে বরণ করতে হবে, নতুবা আমি ফিরে যাব। কারণ, তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করে এনেছ, আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে আসিনি।

আজও মুসলিমরা কাফিরদের কাছে যায়, কিন্তু ইজ্জতের সাথে নয়, বরং দুর্বল ও পরাজিত মনোভাব নিয়ে।

সপ্তম লক্ষণ ঃ

আশা-আকাংখার সংকীর্ণতা

অনেক উলামায়ে কেরাম এমন রয়েছেন, যাদের আকাংখা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এমন উচ্চাকাঙ্খী আলেম খুব কমই আছেন, যিনি এই দ্বীনকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়ন করার আশা পোষণ করেন। তারা উচ্চাকাঙ্খা ও বুলন্দ হিম্মত হারিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ আশা-আকাঙ্খা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকেন।

যারা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের অবস্থাও তথৈবচ। সীমাবদ্ধ কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করাকেই তারা যথেষ্ট মনে করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত দ্বীনের পরিপূর্ণ বাস্ত বায়নের মহৎ ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অনেকের মাঝেই নেই। অথচ শরীয়তসম্মত বিষয়ে অন্তরে উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করা একটি প্রশংসনীয় ও কাম্য বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনদের এই গুণের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

"যারা (রহমানের বান্দা) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যাদের দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ করুন। (সুরা আল-ফুরক্বানঃ৭৪)

এখানে প্রথভ্রষ্টদের নয়, সাধারণ নেককার মুসলিমদেরও নয়, বরং মু'মিনদের মধ্যেকার মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ ও ইমাম হতে যারা প্রত্যাশী, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ ধরনের প্রত্যাশা উচ্চ মনোবলের পরিচায়ক। আর তা অর্জন করার জন্য চাই কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ।

বর্তমান মুসলিমদের এ ধরনের উচ্চাকাঙ্খা পোষণ না করার পিছনে একটি কারণ রয়েছে। তা হলো শিক্ষার্থী ও মুসলিম যুবকগণ তাদের চিন্তা-চেতনাকে এই বৃত্তে আবদ্ধ করে ফেলেছে যে, তাদের প্রকৃত আদর্শ হল সমাসাময়িক কোন ব্যক্তিত্ব, বা তার জীবন গঠনে যার ভূমিকা রয়েছে। যেমন তার উস্তাদ বা কোন নেতা। কিন্তু সে প্রকৃত আদর্শ হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্ধারণ করেনি। শুধু তাই নয়, বরং এই শিক্ষার্থী স্বীয় উস্তাদ হতে অগ্রগামী হওয়ার কল্পনাতো করেই না, অধিকন্ত এ জাতীয় উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করাকে উস্তাদের সাথে চরম বেআদবী মনে করে। সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তার উস্তাদ এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যেখানে পৌঁছা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ফলে সে যদি কখনও কোন বিষয়ে তার উস্তাদকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখে তখন সে উস্তাদের সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করাকে বেআদবী ও মানহানিকর মনে করে। সে মনে করে যে, উস্তাদের সিদ্ধান্তই হয়ত সঠিক। অথচ তার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি যে, "ছাত্র তার উস্তাদ থেকে বড় হতে পারে না" তাহলে তো মুসলিমদের ক্রমশ অধঃপতনই হতে থাকবে। কারণ, উস্তাদ যদি বিদ্যা-বুদ্ধিতে এক স্তরে থাকেন, তবে তার ছাত্র হবে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের, ছাত্রের ছাত্র হবে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের। এভাবে নিম্নমুখী হতে হতে এক সময় সাধারণ মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাবে।

এ ধরনের চিন্তাধারা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিমরা যদি তাদের মানসিকতাকে এ ধরনের চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধ করে রাখে, তাহলে কোন ক্ষেত্রেই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা হীনমন্যতা ও বিপর্যস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। ছাত্র যদি উস্তাদ হতে বড় হয়ে যায়, তাতে উস্তাদের মর্যাদাহানী হয় না, বরং তা উস্তাদের জন্য সম্মানজনক ও গৌরবের বিষয়।

আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কি বলতে পারেন, শায়খুল ইসলাম (র.) এর উস্তাদ কারা ছিলেন? ইমাম বুখারী (র.) এর উস্তাদ কারা ছিলেন? কারা ছিলেন ইমাম মুসলিম (র.) এর উস্তাদ? এ ইমামত্রয়ের প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের আকাশের এক-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। অমর কীর্তির কারণে তাদের সুনাম দিগন্ত প্রসারিত, তাদের খ্যাতি আকাশচুম্বি। কিন্তু কারা তাদের উস্তাদ, সে খবর অনেকের কাছে নেই।

কাজেই আমাদের উপরোক্ত ধারণা যদি ঠিক হত, তাহলে আমি বলব, শায়খুল ইসলাম, ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) কখনও এত বড় হতে পারতেন না।

অষ্টম লক্ষণ ঃ

স্ব-ধর্মকে নানাবিধ অভিযোগের শিকার মনে করা

এ লক্ষণটি সাধারণতঃ এমন কিছু মুসলিম লেখক ও যুবকদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যারা পাশ্চাত্য পন্থীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু মুসলিম লেখকের শুধু ইসলামের উপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ-অপবাদের খন্ডনমূলক লেখা লিখতে থাকে। মনে হয় যেন তারা অপবাদের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। ফলে তাদের সব লেখাই হয় প্রতিবাদমূলক। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন নয়টি বিয়ে করলেন? ইসলামে একাধিক বিয়ের অনুমতি কেন দেয়া হল? চোরের হাত কাটা হয় কেন? এই বিধান এমন কেন? বিবাহিত ব্যভিচারীকে মৃত্যুদন্ড কেন? এই বিধানের হিকমত বা যুক্তি কি? এই ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেই তারা বেশী ব্যস্ত থাকে।

অবশ্য কেউ যদি এ সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য জবাব প্রদানের কথা ভিন্ন। কিন্তু কারো সাধারণ অভ্যাস যদি এমন হয়, তাহলে এটা হবে তার দুর্বল মনোভাব ও পরাজিত মানসিকতার লক্ষণ।

অনুরূপ ভাবে এক শ্রেণীর যুবক, বিশেষ করে যারা পশ্চিমা দেশ গুলোতে যাতায়াত করে, তারা যখন ভিন্ন ধর্মের লোকদের মুখোমুখি হয়, তখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয় এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের হেকমত ও যুক্তি নিয়ে আলোচনা করাকে প্রাধান্য দেয়। তাদের ধারণা হল, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকে নিমিষেই দূর করে দেয়া যাবে। অথচ তাদের এ ধারণা ভুল। কারণ, পশ্চিমারা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। তাদের অভিযোগ যতই খন্ডন করা হোক না কেন, তাদেরকে কখনই সন্তুষ্ট করা যাবে না। তাদের অভিযোগের একমাত্র জবাব হল, শরীয়ত অনুযায়ী আমল ও তার সফল বাস্তবায়ন। কারণ পূর্ণাঙ্গ শরীয় অনুযায়ী আমল করার ফলে আমাদের সমাজের শান্তি শৃংখলা যখন তারা অবলোকন করবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য, সত্যতা ও সার্বজনীনতা বুঝতে সক্ষম হবে, তখন তারা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের কুফল প্রত্যক্ষ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। এছাড়া তাদেরকে অন্য পন্থায় সন্তুষ্ট করা যাবে না।

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রঃ) তাদের অভিযোগ খন্ডাতে অভিযুক্ত বিষয়ের হেকমত দর্শানোর পিছনে না পড়ে ভিন্ন একটা পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি তার লেখনিতে উল্লেখ করেন, যখন তিনি আমেরিকায় অবস্থান করতেন, তখন তার সমসাময়িক লেখকগণ পশ্চিমাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রশ্নের জবাব দিলেও তিনি জবাব দানে

বিরত থাকতেন, বরং তিনি পশ্চিমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও জীবনাচার সম্পর্কে পাল্টা অভিযোগ তুলতেন।

সাইয়্যিদ কুতুবের ভূমিকাটি অত্যন্ত সুন্দর। তার দৃষ্টান্ত এমন যে ধরুন, কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি অস্ত্র তাক করে আছে, তখন আপনার প্রথম কর্তব্য হবে তাকে নিরস্ত্র করা। অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে আপনার যুক্তি দর্শন তার সামনে তুলে ধরা। কাজেই পশ্চিমাদের নীরব করার উত্তম পন্থা হলো, উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পাল্টা তাদের ধর্ম ও জীবনাচারের উপর অভিযোগ করা। এতে তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও জীবনাচার তা মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বরং তা একেবারেই কল্পনা প্রসূত। তা বুঝতে সক্ষম হবে।

কিন্তু আফসোস! আমাদের ভূমিকা এমন শক্তিশালী হচ্ছে না। আমরা শুধু পরাজিত ব্যক্তির ন্যায় আত্মরক্ষার ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রয়েছি।

নবম লক্ষণ ঃ

বিশ্বময় আল্লাহর দ্বীন প্রচারে শিথিলতা ও অলসতা

এ লক্ষণটি দেখা যায় দুর্বল ঈমানের অধিকারী এক শ্রেণীর মুসলিমদের মাঝে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর ভূল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে, যে সব ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা যাক।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.

“এমন একটি যুগ অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরি, যা নিয়ে সে পর্বত শৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহে আশ্রয় নিবে এবং ফিৎনা হতে বাঁচার জন্য সে দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।” (বুখারী ঃ ২/৯৬১)

দুর্বল মনের লোকেরা সমাজ-সংস্কারের বিষয়ে নিরাশ হয়ে এই মর্মের হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠে। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসও তারা দলিল হিসাবে পেশ করে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

لا يأتى عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.

“তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্তাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুহুর্তেই পূর্বের চেয়ে খারাপ হতে থাকবে।” (বুখারী ২/১০৪৭)

এই মর্মের হাদীসগুলো দেখে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা নৈরাশ্যবাদীরা হাদীসগুলোকে যেমন ব্যাপক মনে করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে হাদীসগুলো তেমন ব্যাপক নয়। হাদীস বিশারদগণ এই মর্মের হাদীসসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে প্রায় সকলেই বর্ণিত পরিস্থিতিকে বিশেষ যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। যেমন অনেকেই বলেছেন, এ হাদীসসমূহ খিলাফতে রাশেদার পরবর্তী একটি বিশেষ যুগের দিকে তথা হাজ্জায ও ইয়াজিদের শাসনকালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাস্ত বেও তাই ঘটেছিল। তাদের যুগটা এমন ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল যে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বের চেয়ে শোচনীয় ছিল। হাদীসসমূহে সর্বযুগের কথা বলা হয়নি বিধায় এ কঠিন যুগ পেরিয়ে পুনরায় খেলাফতে রাশেদার সাদৃশ্যে উমর ইবনে আব্দুল আজিজের স্বর্ণোজ্জ্বল খেলাফতকাল উম্মতের উপর অতিবাহিত হয়েছিল।

আল্লামা শায়েখ আলবানী (র.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটিকে অন্যান্য হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাগণকে অতি নিকটবর্তী এক দুঃসময়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে সতর্ক করে গেছেন। সাথে সাথে অন্য হাদীসে এই সু-সংবাদও দিয়ে গেছেন যে, সমাগত অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটবে এবং খেলাফতে রাশেদার নমুনায় ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সু-সংবাদ যখন অন্যান্য হাদীসে সুস্পষ্ট, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, উপরোক্ত হাদীসগুলোতে সর্বকালের কথা বলা হয়নি। তাই উসুলে ফিকহর পরিভাষায় এই হাদীসকে বলা হবে ঃ عام خاص منه البعض

অর্থাৎ হাদীসটি শাব্দিকভাবে ব্যাপক হলেও তার ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ ক্ষেত্রের সাথে সীমাবদ্ধ।

মোট কথা, উক্ত হাদীসগুলো ব্যাপক নয়। তাই স্থান বিশেষ কখনো পরিস্থিতির নাজুকতার কারণে নির্জনতা অবলম্বন জরুরী হলেও তা কেবল সাময়িক সময়ের জন্য হতে পারে। কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালে নির্জনবাসের মনোবৃত্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পর্যাপ্ত ত্যাগ স্বীকার করলে আজও খেলাফতে রাশেদার মত ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এর বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর ভুল-ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে হীনমন্য হওয়ার কোন কারণ নেই।

দশম লক্ষণ ঃ

মানব রচিত আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা

এক শ্রেণীর মুসলিম এমনও আছে, যারা জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল নয়। ফলে তারা মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের দিকে ঝুকে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে তারা মুসলিম আধ্যুষিত অনেক রাষ্ট্রে মানব রচিত মতবাদ বাস্তবায়ন করেও ফেলেছে। আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য কোন মতবাদকে জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তাদের কাছে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রয়েছে তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। ইসলামকে বর্জন করে মানব রচিত আইন গ্রহণ করার কারণেই তারা আজ সামগ্রিকভাবে অধঃপতন ও বিপর্যস্ততার এই স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দ্বীন সম্পর্কে এহেন ধারণা পোষণ করা কুফরী। আল্লাহ আমাদেরকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা করুন এবং সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানসিক বিপর্যয়ের কারণসমূহ

মানসিক বিপর্যয়ের কিছু কারণ রয়েছে আভ্যন্তরীণ- যা নিজেদেরই সৃষ্ট। আর কিছু কারণ রয়েছে বহিরস্থ যা শত্রুদের সৃষ্ট। নিম্নে আমরা উভয় প্রকার কারণ নির্দেশের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। প্রথমে আভ্যন্তরীণ কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ

প্রথম কারণ ঃ

ঈমানের দুর্বলতা

ঈমান যখন দুর্বল হয়ে যায়, মনোবল তখন ভেঙে পড়ে। অন্তর হয়ে উঠে হতাশা গ্রস্ত। ব্যক্তি তখন ধৈর্যহারা হয়ে বিপদ-আপদ সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে তার পক্ষে মহান কোন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সে এমন সব সাধারণ ও তুচ্ছ কাজে লিপ্ত হয়, যা তার ব্যক্তিত্বকে আরও দুর্বল ও খাটো করে দেয়।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থাও এ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। ঈমানী দুর্বলতার কারণে তারা হীনমন্য, ধৈর্যহীন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াবলী ছেড়ে দিয়ে তারা সাধারণ ও অনর্থক কাজে লিপ্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ

জিহাদ বর্জন

বর্তমানে মুসলিমগণ প্রকৃত অর্থে জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ বর্জনের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন জিহাদ বর্জন মুসলিমদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান-অপদস্থতা ডেকে আনবে। সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم إذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

"যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করবে, চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, জমিজমা ও ফসল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ বর্জন করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান-লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। এ অপমান-অপদস্থতা থেকে

তোমরা মুক্তি পাবে না যতক্ষন না তোমরা তোমাদের ধর্মে (জিহাদে) ফিরে আসবে। (আবু দাউদ ঃ ৪৯০)

ব্যাখ্যা ঃ عينه "ঈনা" এক প্রকার বিক্রয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কৌশলে সুদী লেনদেন করা হয়। বর্তমানে তো কৌশলে সুদ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। মুসলিমগণ সরাসরিই সুদী কারবারে জড়িত।

أخذتم أذناب البقر অর্থ ঃ তোমরা গরু বা বলদের লেজ ধরবে- এ বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে চাষাবাদের প্রতি।

رضيتم بالزرع ফসল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে- বাক্য দিয়ে বুঝানো হয়েছে তোমরা পার্থিব ভোগ বিলাসিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।

لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم আল্লাহ তোমাদের লাঞ্ছনা ঘুচাবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে- হাদীসের এই অংশটি হচ্ছে চিকিৎসা। অর্থাৎ সুদী কারবার, পার্থিব ভোগ বিলাসিতা অবলম্বন ও জিহাদ বর্জনের ব্যাধিতে যখন মুসলিম উম্মাহ আক্রান্ত হবে তখন তারা চরমভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। দ্বীন ইসলামকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং জিহাদের ঝান্ডা হাতে নিতে হবে।

তৃতীয় কারণ ঃ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে অনিবার্য বিপদাপদের ভয়

দ্বীন আহকাম পালনে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে যেসব বিপদাপদের মুখোমুখি হতে হয়, বর্তমান মুসলিমগণ তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। সেগুলোকে তারা অনাকাঙ্খিত মনে করে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারা যেন এই আশা নিয়ে বসে আছে যে, দ্বীনের পথ হবে কুসুমাস্তীর্ণ, সহজ-সংক্ষেপ ও বিপদমুক্ত। অথচ প্রকৃত সত্য হল, দ্বীনের পথ হচ্ছে বিপদসংকুল ও কন্টকাকীর্ণ। পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তাআলা এসব বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ .

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে, 'আমরা ঈমান এনেছি' আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যারা এদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ নিশ্চয়ই জেনে নিবেন (প্রকাশ করবেন) কারা

সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন (প্রকাশ করবেন) কারা মিথ্যাবাদী।” (সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

সুতরাং যারা এ আশা পোষণ করে যে, দ্বীনের পথ হবে নিস্কন্টক, সহজ ও বিপদমুক্ত, তারা মূলত ঃ ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেননা বিপদাপদ এসে থাকে ইসলাম অনুসরণে একনিষ্ঠতার দাবীতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জেনে নিবেন (প্রকাশ করে দিবেন) কারা সত্য বলেছে, আর কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।”

যারা সত্যবাদী, শত বিপদের সময়েও তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকে। আর যারা মিথ্যাশ্রয়ী, বিপদের সময় তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়।

সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা তো আর দাবী করে প্রমাণ করার বিষয় নয় যে, ‘আমার ঈমান ঠিক’ ‘আমার দিল সাফ’ ইত্যাদি বাগাড়ম্বর দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। বরং সত্যবাদিতা হল কঠিন বাস্তবতা- যা প্রমাণিত হয় বাস্তব জীবনে বিপদ ও মুসীবতের মুখোমুখি হলে।

এ বিপদ দু'ধরনের হয়ে থাকে, ছোট ও বড়। দ্বীনের উপর চলতে গিয়ে পরিবারস্থ লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দিক থেকে যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো ছোট বিপদ। আর জেল, জুলুম, হত্যা, নির্যাতন, নাগরিকত্ব হরণ ইত্যাকার মুসিবত হল বড় বিপদ। ছোট হোক, আর বড় হোক- দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাধা-বিপত্তি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। এসব বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে এবং দুঃখ-যতনা জয় করেই অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার জন্য সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা দ্বীনের পথ হল কন্টকময়, বন্ধুর। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

حفت النار بالشهوات وحجت الجنة بالمكاره

“জাহান্নামকে প্রবৃত্তির কামনা দ্বারা, আর জান্নাতকে কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।” (বুখারী : ২/৯৬০)

অর্থাৎ যে সব কর্মের পরিণতিতে মানুষ জাহান্নামে যাবে, তার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও মনোগ্রাহী। সফস বা প্রবৃত্তি এগুলোকে খুবই পছন্দ করে। এজন্য জাহান্নামের পথ অতি সহজ। আর যে সব কর্মগুণে মানুষ জান্নাতের অধিকারী হবে, সেগুলো কঠিন ও কষ্টকর। প্রবৃত্তি কখনো তা করতে চায় না। এজন্য জান্নাতের

রাস্তা কঠিন ও বিপদসংকুল। তাই জান্নাতের প্রত্যাশী ঈমানদারদের বিপদাপদে মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

চতুর্থ কারণ ঃ

ক্ষেত্র বিশেষের ব্যর্থতাকে সার্বিক ব্যর্থতা মনে করা

এক শ্রেণীর মানুষ এমন রয়েছে, যারা কোন এক ক্ষেত্রের ভুল-ভ্রান্তিকে সর্বক্ষেত্রের ভুল মনে করে এবং ক্ষেত্র বিশেষের ব্যর্থতাকে সার্বিক ব্যর্থতা বিবেচনা করে সীমাহীন মানসিক যন্ত্রনায় ভুগতে থাকে। নিজের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, "ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই ভাগ্যে নেই।" ফলে সে হতাশা ও মানসিক দুর্বলতায় চরমভাবে নিপতিত হয়।

পঞ্চম কারণ ঃ

ইতিহাসকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বিবেচনা করা

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোন ব্যক্তি এমন শহরে বসবাস করে, যেখানে মুসলিমদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ লোক তার এলাকার এ সমস্যাকে ব্যাপক আকারে দেখতে শুরু করে। মনে করে, সারা পৃথিবীতেই বুঝি মুসলিমদের এই দুর্দশা। ফলে সে হতাশায় ভুগতে থাকে। কাজেই এ ধরণের বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যাকে ব্যাপকরূপে বিবেচনা করা উচিত নয়। অন্যথা হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

কিছুদিন পূর্বে আমি জনৈক লোকের সাথে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলছিলেন, "আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের মাঝে কোরআন হিফজ করার চর্চা এখনো গড়ে উঠেনি। বড়রাও মৃত্যু পথযাত্রী। এ অবস্থা চলতে থাকলে তো হাফেজে কুরআনের সংকট প্রকট আকারে দেখা দিবে।" এ লোক নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন। অথচ তিনি যদি বহির্বিশ্ব সফর করতেন, কিংবা তার আশেপাশে নজর দিতেন তাহলে অবশ্যই তার এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটত। তিনি দেখতে পেতেন যে, সাধারণ মুসলিমদের মাঝে ইসলামের চর্চা কত বেশী, আর দ্বীনি চেতনা কত প্রখর। হয়তো সামাজিক কোন সমীবদ্ধতা কিংবা অন্য কোন কারণে তার এলাকায় সে চেতনা অনুভূত হচ্ছে না।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে দেশ-বিদেশে সফর করলে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পড়া- লেখা করলে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে, যা মনে আশাবাদ সৃষ্টি করবে এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। সুতরাং নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে নিরাশ হতে হবে।

অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধিকে যদি বিশেষ কোন সময়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলেও অন্তরে হতাশা ছেয়ে যাবে। যেমন, বর্তমান সময়ের প্রতি

লক্ষ্য করে যদি বলা হয়, আন্তর্জাতিক সীমারেখা ইসলামী বিশ্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে, গোটা মুসলিম জাতি ভূখন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পারস্পরিক অবস্থান খুবই দুর্বল, দ্বীনের দা'য়ীগণও প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে মেহনত করেছেন, তাহলে এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিবে।

পক্ষান্তরে আমরা যদি অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে সেখান থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি। তাতারীদের সময়ের কথাই ধরা যাক। তাতারীরা মুসলিমদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে তারা অবলীলায় হত্যা করেছে। লাগাতার দীর্ঘ চল্লিশ দিন তারা মুসলিম নিধন করেছে। তাদের ভয়ে সমস্ত মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করেছিল যে, দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবত বাগদাদে কেউ জামাআতে নামাজ আদায় করতে বের হয়নি।

হিজরী চতুর্থ শতকের শুরুতে কারামেতা বাহিনী পূর্ব আরব শাসন করত। তিনশত তের হিজরীর ৮ই যিলহজ আবু তাহের কারামতীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে অসংখ্য মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং "হাজরে আসওয়াদ" ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর তাদের নেতা সদম্ভে চিৎকার করে বলে, 'কোথায় সে আবাবীল পাখি! কোথায় পাথর বৃষ্টি?' এ জালিমরা হাজরে আসওয়াদ ছিনিয়ে নিয়ে দীর্ঘ বাইশ বৎসর (৩১৭-৩৩৭ হিঃ) পর্যন্ত পূর্ব আরবে স্থাপন করে রাখে। সেখানে শুধু শিয়া কারামতীরাই হাজরে আসওয়াদের তাওয়াফ করতো। তারা কা'বা শরীফ স্থানান্তারিত করার মত চরম দৃষ্টতাও দেখিয়েছে। এতদসত্বেও মুসলিম উম্মাহ পুনরায় তাদের শক্তি সম্মান ফিরে পেয়েছে।

খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনী বায়তুল মোকাদ্দাসকে জবর দখল করে দীর্ঘ একানব্বই বছর পর্যন্ত তারা মসজিদে আকসায় তালা ঝুলিয়ে রেখেছিল। না জামাআত হতো, না জুমআ হত, বরং ৪৯২ হিজরী থেকে ৫৮৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবত আল-আকসার উপর ক্রুস স্থাপিত ছিল। কিন্তু তারও অবসান ঘটে এবং মুসলিমরা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর (র.) নেতৃত্বে বায়তুল মোকাদ্দাস খৃস্টান- দখল মুক্ত করে।

পক্ষান্তরে বর্তমানে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর ইয়াহুদী শাসন এখনও পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেনি। সেখানে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় হচ্ছে, জুমআর জামাআতও হচ্ছে, এখানে মসজিদের উপর ক্রুস স্থাপিত হয়নি। এতদসত্বেও মুসলিমদের মাঝে দেখা যায় পরাজয় ও দুর্বলতার ছাপ। তারা ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আর বলছে, ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা যেহেতু বাস্তব, সেহেতু তার সাথে শান্তি ও সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

অথচ অতীতে যখন ক্রুসেডার বাহিনী আল-আকসা দখল করেছিল, তৎকালীন মুসলিমগণ নিজেদেরকে দুর্বল ভাবেনি, পরাজিত মনে করেনি, বরং তারা আল্লাহ তাআলার এ অভয়বাণীকে সামনে রেখে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিলো ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দু:চিন্তা করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও। (সুলা আলে ইমরান : ১৩৯)

ইতিহাস সাক্ষী, তৎকালীন মুসলিমগণ নিরাশ হয়নি, ভেঙ্গে পড়েনি। ইবনে কাসীরের 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' খুলে দেখুন, ৫৮৩ হিজরীতে কি বীর-বিক্রমে মুসলিম বাহিনী আল-আকসায় প্রবেশ করেছিল এবং দীর্ঘ একানব্বই বছর পর সেখানে তারা কি বীরত্বের সাথে জুমআর নামাজ আদায় করেছিল।

এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা মনে আশার সঞ্চার করে যে, বর্তমান অবস্থাও অতি দ্রুত পরিবর্তিত হবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মাঝে নিজের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে আমাদেরকে তা হতাশায় নিমজ্জিত করবে। ইতিহাসের এ সব ঘটনাবলী গভীরভাবে আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত। তাহলে ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টি হবে এবং অন্তরে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হবে।

ষষ্ট কারণ ঃ
শক্তির উৎস-দ্বীন অনুসরণে চরম শিথিলতা

দ্বীন ইসলাম আঁকড়ে ধরে আমরা যে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি, সে বাস্তবতার উপলব্ধি আমাদের নেই। আমরা আমাদের দ্বীনকে ছেড়ে দিয়েছি এবং তার মাঝে লুকায়িত প্রবল শক্তির অনুসন্ধান বর্জন করেছি। আমাদের ধর্মে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিধি-বিধান, তেমনি রয়েছে যাবতীয় বৈষয়িক সমস্যার সুষম সমাধান, যা কেয়ামত পর্যন্ত জীবন-পথের বিস্তৃত পরিসরে সকল সমস্যর সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম। কোন জাতির জীবনে এর চেয়ে চরম ব্যর্থতা আর কি হতে পারে যে, সে পরিপূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী এবং বিশাল ধন-ভান্ডারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও এই শক্তি-সামর্থ ও বিপুল অর্থবিত্ত তার কোন কাজেই লাগাতে পারলো না। কবির ভাষায় ঃ

ولم أر فی عیوب الناس شیئا ، کنقص القادرین علی التمام.

অর্থঃ শক্তি আছে পূর্ণ করিবার পূর্ণ করে না তবু,
এর চে' বড় দোষ মানুষের মাঝে দেখিনি আমি কভু।

সপ্তম কারণ ঃ

উচ্চাকাংখার অভাব

বর্তমান মুসলিমদের অনেকের মাঝেই লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের ভবিষ্যত আশা-আকাঙখা অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত। তারা বড় ধরনের কোন আশা পোষণ করে না বিধায় উন্নতির শিখরে পৌঁছা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তারা পর্বত শৃঙ্গে আরোহনের সাহস হারিয়ে গুহা উপত্যকায় পড়ে জীবন কাটাচ্ছে, যা তাদের জন্য চরম অবমাননাকর। কবির ভাষায় ঃ

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبداالدهر بين الحفر

অর্থঃ পর্বত শৃঙ্গে আরোহনে ভীত হয়ে যে জন
গুহার মাঝে জীবন তাহার কাটে আমরণ।

আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদা তিনি তার এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার মত হতে চাও?

ছেলে বলল ঃ আমি আপনার মত হতে চাই।

আলী (রাঃ) বললেন ঃ না, বল! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত হতে চাই। কেননা তোমার অভীষ্ট লক্ষ যদি হয় আলী, তাহলে তুমি হয়ত আলীর স্তরে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু তোমার লক্ষ যদি হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাকেই যদি তুমি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কর তাহলে তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত না হলেও অসম্ভব নয় যে, তুমি আলীকে অতিক্রম করে যাবে।

সুতরাং বুঝা গেল, মানুষের লক্ষ্য যত বড় হবে, আশা-আকাঙ্খা যত মহান হবে, চেষ্টা সাধনা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সে তত বড় হতে পারবে।

অষ্টম কারণ ঃ

পরাজিতের ন্যায় বিজাতির অন্ধানুকরণ

কোন জাতি যখন অন্য জাতির কাছে পরাজিত হয়, তখন সে বিজয়ী জাতির সংস্কৃতির অনুসরণ করতে শুরু করে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় বিজিত জাতির এই দুর্বল মানসিকতার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ

"বিজিত সর্বদা বিজয়ীর অন্ধানুকারণের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রাক্ত হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রেই বিজিত জাতি বিজয়ীর অন্ধানুকারণ করতে শুরু করে। কেননা, মানুষের স্বভাব হল, সে বিজয়ীর মাঝে সর্বদা পূর্ণতাই দেখতে পায়। বিজয়ীর

জয় পরাজিতের মনে এই বিশ্বাসই জন্ম দেয় যে, বিজয়ী কোন সাধারণ ক্ষমতায় বিজয় লাভ করেনি। বরং সে তার আদর্শিক ও সংস্কৃতিক পূর্ণতার কারণেই বিজয়ী হয়েছে। এজন্য পরাজিত পক্ষ বিজয়ী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়।"

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, মানসিক এ দুর্বলতা তথা বিজয়ী জাতির অন্ধানুকরণ বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মাঝে পুরোপুরিই বিদ্যমান। তারা সব ক্ষেত্রেই বিজাতির অন্ধানুকরণ করে চলছে।

মানসিক বিপর্যয়ের বহিরস্থ কারণসমূহ

প্রথম কারণ ঃ

শত্রু পক্ষের সামরিক শক্তিকে অপরাজেয় মনে করা

এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা মনে করে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এক একটি পরাশক্তি। এদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈমানের দুর্বলতার কারণেই তারা তথাকথিত পরাশক্তির সামনে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে। অথচ তারা যদি আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তি ও অগণিত অদৃশ্য বাহিনীর কথা চিন্তা করতো- যার হিসাব একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হত যে, আল্লাহর নির্দেশে সামান্য একটি ভূমিকম্পই মেক্সিকো ও সানফ্রান্সিসকো'র মত জৌলূসপূর্ণ শহরকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আল্লাহর নির্দেশে তাদের তৈরী আনবিক বোমা তাদের দিকেই বুমেরাং হতে পারে। 'চেরনোবিল' এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আজও তাদের হৃদকম্পন সৃষ্টি করে, যে ঘটনায় নিহত হয়েছিল অসংখ্য বনী আদম। এ ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা এই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে যে, কিভাবে আনবিক শান্তির বিস্তার রোধ করা যায়। (গ্রন্থকারের এ বক্তব্যটি সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পুর্বে দেয়া। সোভিয়েট রাশিয়ার পতন তার এ আশাবাদকে আরো জোড়ালো করেছে। সম্পাদক)

সুতরাং মুসলিমদের এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আমাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য বাহিনীই যথেষ্ট যে বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার সাধ্য কোন পরাশক্তির নেই। তথাপি আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আসবাব গ্রহণ ও বৈষয়িক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে। তবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ

মুসলিমদের দুর্বল করতে পশ্চিমাদের স্নায়ুযুদ্ধ

শত্রুরা মুসলিমদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শন, গুজব, অপপ্রচার ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে বিশাল আকারে প্রকাশ করে থাকে। অথচ এ অপপ্রচারের পিছনে ততটা বাস্তবতা নেই। তাদের এই চক্রান্ত

নস্যাৎ করে বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ঈমান, পাহাড়সম ধৈর্য এবং পরিপূর্ণ তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

"আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের কোন চক্রান্তই তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" (সুরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

পঞ্চম : বাহিনী সমস্যা

আমাদের মাঝে একটি শ্রেণী রয়েছে, যারা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই ভাই, আমাদের ভাষাতেই কথা বলে এবং আমাদের দেশেই তারা বসবাস করে, কিন্তু প্রতিপালিত হয়েছে শত্রুদের কোলে। তারা শিক্ষা পেয়েছে পশ্চিমাদের কাছ থেকে। তাদের মস্তিস্কের খোরাক পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি। তারা স্বদেশে বসে পশ্চিমাদের জয়গান গায় এবং তাদের তথাকথিত সভ্যতার বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। এরা মূলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার(?) সামনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। নিজেদেরকে পশ্চিামাদের কাছে বিক্রি করে ফেলেছে। রক্তে মাংসে যদিও তারা মুসলিম, কিন্তু বাস্তবে তারা কপট-পঞ্চম বাহিনী এবং ইসলামের চরম দুশমন।

চতুর্থ কারণ ঃ

মুসলিম নেতৃবৃন্দকে প্রবৃত্তির জালে জড়াতে শত্রুদের চক্রান্ত

শত্রুরা বর্তমান মুসলিমদের দুর্বলতার উৎস ভালভাবেই জেনে নিয়েছে। এজন্য তারা মুসলিমদের পরাজিত করতে সে পথেই অগ্রসর হচ্ছে। দুর্বলতার সে উৎস পথটি হল নফস বা কু-প্রবৃত্তি। পশ্চিমারাও এ কথা স্বীকার করেছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নবম লুইস মিসর আক্রমনের সময় আল-মানসুরায় বন্দী হয়। অতঃপর তাকে চার বৎসরের কারাদন্ড দেয়া হয়। বন্দী জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে সে মুসলিমদের মানসিক অবস্থা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মুক্তির পর স্বদেশে ফিরে সে তার জাতিকে বলেছিল, "সমর শক্তিতে কখনোই তোমরা মুসলিমদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাদেরকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় কমনীয় নারী ও সুপেয় শরাবের পেয়ালা"।

মিঃ লুইসের দেয়া এ তথ্যই শত্রুরা আজ কাজে লাগাচ্ছে। শত্রুরা তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে এ পথটি বেছে নিয়েছে। খাহেশাতে নফসানী তথা প্রবৃত্তির তাড়নার এ ঘৃণিত পথেই তারা মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। যেমন, 'আল-মাসুনিয়া'র মত সংগঠনগুলো অতি ঘৃণিত পথে তাদের কার্যসিদ্ধি করে থাকে। বিভিন্ন

ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তারা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সেখানে দাওয়াত করে। সমাজের বড় বড় ব্যক্তি ও সরকারী উপরস্থ প্রতিনিধিগণই এতে উপস্থিত হয়। এ সকল সংগঠনের লক্ষ হল, ইসলামী দুনিয়ার বড় বড় ব্যক্তিত্বকে ঘায়েল করা এবং তাদের চরিত্রে কালিমা লেপন করা। দাওয়াত পেয়ে নেতৃবর্গ সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে মদ ও নারী দিয়ে তাদের কু-প্রবৃত্তি চাঙ্গা করে কোন রূপসীর সাথে অভিসারে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় এবং তা ক্যামেরা বন্দী করে মূলতঃ তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়। তারপর এসব ছবি বা ভিডিও ক্যাসেটকে পুঁজি করে শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার সুযোগে তারা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত স্থানগুলোতে তাদের লোক নিয়োগের প্রস্তাব করে। যেমন, তারা বলে ঃ 'আমাদের সুশিক্ষিত অমুক ব্যক্তিকে আপনার অমুক দপ্তরে নিয়োগ দিতে হবে এবং তার পদ হতে হবে সর্বোচ্চ। আমাদের এ প্রস্তাবে আপনি অসম্মত হলে আপনার এ ক্যাসেট আমরা সারা দুনিয়ায় প্রচার করে দিব। নেতার পক্ষে তখন ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভ হয় না। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে তা মেনে নিতে হয়। অন্যথায় তার ইজ্জত সম্মান (?) সবই যে শেষ হয়ে যাবে!

অনুরূপভাবে নেতৃবৃন্দের জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রমাণ শত্রুদের হাতে থাকে, যার কারণে নেতৃবৃন্দ তাদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকেন। আর তাদের এ দুর্বলতার সুযোগে শত্রুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি মদ ও নারীর হাতছানিতে আত্মভোলা না হতেন, ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণ করে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে নিজেদের চরিত্রকে কলঙ্কিত না করতেন তাহলে তারা স্বাধীন ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারতেন। শত্রুরাও তাদের কার্যসিদ্ধিতে সফল হতে পারতো না এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানসিক বিপর্যয় হতে মুক্তি লাভের উপায়

{ইতিপূর্বে মানসিক বিপর্যয়ের কতিপয় লক্ষণ ও কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে উক্ত ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভের উপায় সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দেয়া হলো, যা অনুসরণ করলে মুসলিম উম্মাহ এ ভয়াবহ মানসিক বিপর্যয় হতে মুক্তি লাভ করে ভবিষ্যত বিনির্মাণে অগ্রসর হতে পারবে বলে আশা করা যায়}

এক. সমস্যা উপলব্ধি করা

প্রথমতঃ আমাদেরকে সমস্যা উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, সমস্যা উপলব্ধি না করলে সমাধানের প্রশ্নই উঠে না। এজন্য বলা হয় 'সমস্যা উপলব্ধি সমাধানের অর্ধাংশ'।

সমস্যা উপলব্ধির সাথে সাথে সমস্যা সৃষ্টির কারণ চিহ্নিত করতে হবে। অন্যথায় সঠিক পথ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

অতএব, প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমরা ভয়াবহ মানসিক বিপর্যয়ের শিকার এবং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হতে সরে পড়া।

দুই. সহীহ ঈমানের তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা

আমাদেরকে সহীহ ঈমানের তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কারণ বিপর্যয় উত্তরণের এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিশুদ্ধ ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তথা সর্বস্তরের মুসলিমদের খালেস দ্বীনের পূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঈমানের এমন স্তরে পৌঁছতে হবে, যে স্তরে পৌছে তারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে ভয় করবে না।

ঈমান কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির নাম নয়, যা কেবল চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য বিশুদ্ধ ঈমান আক্বীদাকে প্রকৃত অর্থে অন্তরে স্থাপন করতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এক শ্রেণীর লোকের কাছে ঈমান শুদ্ধকরণ ও তা কর্মজীবনে বাস্তবায়নের কোন গুরুত্ব নেই। অধিকন্তু তারা এ বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করে থাকে, তোমরা কেবল আমল-আক্বীদা শুদ্ধ করার কথাই বলো ঃ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমসহ অপরাপর ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বল না!

এর জবাবে আমরা বলবো, সাম্রাজ্যবাদ, পুজবাদ, কমিউনিজমসহ সকল ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সহীহ আক্বীদা বিশ্বাসই পারে কথা বলার শক্তি ও সাহস যোগাতে : চিন্তা ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে এবং সর্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে তুলতে।

ঈমান আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে বাতিলের ভয়ে অন্তর ভীত থাকে। তার বিরুদ্ধে কথা বলার সৎ সহস সৃষ্টি হয় না। নানা প্রকার জেহালাত ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ক্ষুদ্র মাখলুকের ভয়ে হীনমন্য ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে আমি কতিপয় উপমা পেশ করছি।

যামানায়ে জাহেলিয়্যার মূর্খ লোকেরা যখন কোন উপত্যকায় গমন করতো তখন দুষ্ট জিন ও প্রেতাত্মাদের ভয়ে এতই ভীত হতো যে, তারা সামনে এগিয়ে চলার মনোবল পর্যন্ত হারিয়ে ফেলত। জিনদের প্রতি তাদের মাত্রাতিরিক্ত ভয় ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তাদের কাছে সাহায্য চাইতো। তারা বলতো “হে উপত্যকাপতি, আমরা এখানকার প্রেতাত্মা হতে তোমার আশ্রয় চাই, তুমি আমাদের আশ্রয় দাও।”

তাদের এরূপ করার কারণ ছিল, জিনদের সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস। জ্বিনদেরকে তারা ত্রাণকর্তা মনে করত।

কিন্তু আমরা যেহেতু জিনদের ভয়ে ভীত নই এবং জিনদের সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা রয়েছে, সেহেতু আমরা জিনদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করে তাদের সাহায্য কামনা করি না, বরং সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহরই সাহায্য ও নিরাপত্তা কামনা করি। কারণ, জিন সম্পর্কে আমাদের বোধ ও বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত। আমরা জানি, জিনদের মধ্যে সৎ ও অসৎ দু'ধরণের জিন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে জিনদের স্বীকারোক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا . وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ

"আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ আবার এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। (সুরা জিনঃ১১, ১৪)

জিন সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা দ্বীনের দা'য়ী হিসাবে আল্লাহর পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জিন সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হল, এরা আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্ট জীব, যারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। যেমন অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। এ লালিত বিশ্বাস আমাদেরকে এমন শক্তি, সাহস ও এক্বীন প্রদান করে যে, আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সৎসাহস পাই এবং যে কোন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হই। বস্তুতঃ সঠিক আক্বীদা সামগ্রিক জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব উপহার দেয়।

সঠিক ধর্ম-বিশ্বাসই যে মানসিক শক্তির উৎস এবং সর্ব প্রকার প্রকার মনস্তাত্বিক দুর্বলতা বিদূরণের প্রধান উপকরণ সে বিষয়ে আরেকটি উপমা দেয়া যাক।

কোন বিষয়ে শুভাশুভ ধারণা পোষণ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত একখানা হাদীসে রাসূলে পা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لا طيرة وأحب الفال الصالح

"কোন বিষয়ে অশুভ ধারণা রাখা ঠিক নয়, আমি শুভ ধারণা পোষণ করাকেই পছন্দ করি।" (বুখারী ২/৮৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ لا عدوى ولا طيرة

"ইসলামে শুভাশুভের ধারণার ভিত্তি নেই।" (বুখারী ২/৮৫৬)

এই শুভাশুভের ধারণা জাহেলী যুগের মানুষের অন্তরে এতই প্রবলভাবে বদ্ধমূল ছিল যে, সফরের উদ্দেশ্যে বহির্গমনকালে যদি তারা কোন কাল পাখি দেখতো তাহলে তারা সফরের ইচ্ছা ত্যাগ করতো। কারণ, কালো পাখিকে তারা অশুভ লক্ষণ মনে করতো। এদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অমূলক ভয় যে এক প্রকার মনস্তাত্বিক বিপর্যয়- এতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে মুসলিমগণ যখন সঠিক আক্বীদা শিক্ষা লাভ করবে তখন বস্তুর শুভাশুভের ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে জ্ঞান করবে। তারা আরও বুঝবে যে, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জাহেলী যুগের মানুষদের কতই না বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে, তখন মুসলিমরা শুভাশুভের এই অমূলক ধারণাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। বস্তুতঃ এতদবিষয়ে যখন মুসলিমদের বোধ ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তারা বাস্তবিকভাবেই প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হবে এবং তাদের জীবনে এক ক্রিয়াশীল নব অধ্যায়ের সূচনা হবে।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর মুসলিম এখনো সেই জাহেলী যুগের মনোভাব ও ভিত্তিহীন আক্বীদা নিয়ে বসবাস করছে। তারা ঘরের ফটকে গরু বা ঘোড়ার হাড় এবং গাড়ীতে শিশুদের জুতা ঝুলিয়ে রাখে। তাদের ধারণা হলো, এগুলো কুদৃষ্টি হতে গাড়ী ও বাড়ীকে রক্ষা করবে। এটা একটা অলীক ধারণা। এ ধারণা পোষণের কারণ হলো কুদৃষ্টি ও জিনদের প্রতি তাদের সীমাহীন ভয়-ভীতি, যার ফলে তারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে।

পক্ষান্তরে যে মুসলিম প্রকৃত অর্থেই সঠিক আক্বীদা পোষণ করে, সে সর্বদা স্থিতিশীল জীবন যাপন করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ মেনে চলে। কোন পর্যায়েই সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না। উদাহরণতঃ জীবিকা নির্বাহ বা রিযিক যোগাড়ের বিষয়টি মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বহু মুসলিম এমন রয়েছেন, যারা ইসলামী বিধি-বিধান, শরয়ী অনুশাসন অহরহ লংঘন করে চলছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জীবের জীবিকা ব্যবস্থা করেন, তিনি সকলের রিযিকদাতা-রায্যাক, তারা কখনও রিযিক জোগাড় করতে গিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয় না। তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভবপরও নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ঘটনা আমার মনে পড়েছে। লন্ডনে এক আলজেরীয় মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে তার এই ব্যক্তিগত ঘটনাটি আমাকে শোনায়। যুবকটি বলল ঃ

"একদিন আমি কাজের সন্ধানে এক হোটেলে গেলাম। হোটেল মালিক যথারীতি আমার প্রাইভেট ইন্টারভিউ গ্রহণ করল। কিন্তু তার কোন ফলাফল আমাকে জানালো

না, বরং বলল ঃ এ বিষয়ে আমাদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, সেখানেই ফলাফল জানানো হবে। তোমার বিষয়টিও আমরা ভেবে দেখবো।

"অতঃপর সে আমাকে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানালো। হোটেল মালিকের এমন আমন্ত্রণে আমি বিপাকে পড়ে গেলাম। মুসলিম হিসাবে তার এ আহ্বানের সাড়া দেয়া আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু এ মূহুর্তে সাড়া না দিলে যে রিযিকের সম্ভাব্য পথটিও বন্ধ হবার উপক্রম! এজন্য আমি সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলাম। পরক্ষণেই এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মালিক আমাকে চাকুরীর জন্য গ্রহণ করুক বা না-ই করুক, আমি তার এ আমন্ত্রণে কিছুতেই সাড়া দেব না এবং মদও পান করব না। তাই বললাম ঃ "জনাব! আমি মুসলিম, আমাদের ধর্মে মদ্যপান হারাম। এজন্য আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারলাম না।"

এ কথা শুনে হোটেল মালিক বিস্মিত হয়ে বললো, তাই নাকি!

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ তা-ই!

মালিক বলল ঃ তাহলে আর বিলম্ব নয় তুমি এখন থেকেই চাকুরীর জন্য নির্বাচিত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম ঃ তা কীভাবে?

"মালিক বলল ঃ এখানে হোটেল কর্মচারীদের নিয়ে ভীষণ সমস্যা। এরা রাতভর মদের নেশায় মত্ত হয়ে আমোদ ফুর্তিতে কাটায়। তারপর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। এজন্য প্রত্যহ আসতে তাদের দেরী হয়। দেরী করা ছাড়া তারা আসতেই পারে না। তুমি যেহেতু মদ পান করো না সেহেতু তোমার ঘুমাতেও দেরী হবে না, আর আসতেও বিলম্ব হবে না। কাজেই তোমার জন্য সু-সংবাদ, এ হোটেলের চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে তোমাকেই প্রথমে নির্বাচন করা হল।"

বস্তুতঃ মানুষ যখন এ একীন করবে যে, রিযিক একমাত্র আল্লাহরই হাতে, কেউ তার রিযিক বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য রিযিকের অসংখ্য দ্বার উন্মোচন করে দেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেখানে এ যুবক ধারণাই করতে পারেনি যে, নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়ার পর এবং মদ্যপানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পরও তাকে চাকুরীর জন্য গ্রহণ করা হবে, সেখানে তাকে কতইনা সম্মানের সাথে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

তিন. পার্থিব ঘনিষ্ঠতা বর্জন করা

যে সব বিষয় নিছক দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, আখেরাতের কোন ফায়েদা তাতে নেই, কিংবা আখেরাতের জন্য তা ক্ষতিকর, সেসব বিষয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে

হবে। সাথে সাথে আখেরাতের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে হবে। অর্থাৎ পার্থিব লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে নেক আমলের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

এক শ্রেণীর লোভাতুর মানুষ রয়েছে, যারা এসব বিষয়ের কোন বিবেচনা না করেই বিভিন্ন ভোজানুষ্ঠান, অলীমা, বৌভাবত যিয়াফত, চেহলাম, কুরআনখানির দাওয়াতের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এদের সার্বক্ষণিক চিন্তা-ফিকিরই কেবল এসব অনুষ্ঠান। এদের ব্যক্তিগত ইমেজ ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছুই নেই। এর ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। ফলে এরা সামজে মর্যাদাহীনভাবে জীবন যাপন করে।

পক্ষান্তরে এমন বহু আলেম রয়েছেন যারা দাওয়াত যিয়াফতের লোভে ঘুরে বেড়ানো তো দূরের কথা, তাঁরা হাদিয়া গ্রহণ করতেও চিন্তা করেন। বিশেষ করে আত্মম্ভরী ও অহংকারী প্রকৃতির লোকদের হাদিয়া। কারণ, দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ নেই, নেই কোন লোভ-লালসা। এজন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে মহান ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। মানুষের উপর তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রভাব সর্বদা বিরাজমান থাকে। আমরাও যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে পার্থিব লোভ-লাসা পরিত্যাগ করি, তাহলে মানব সমাজে আমরাও মাথা উঁচু করে সগৌরবে বসবাস করতে পারবো এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে পারবো। ইতিহাসে এর বহু নজীর বিদ্যমান। আগের দিনকার রাজা-বাদশাগণও নির্লোভ জ্ঞানী-গুণী দুনিয়া বিমুখ আলেমদের খুবই কদর করতেন।

একবার জনৈক বাদশা এক দরবারবিমুখ আলেমকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার শাহী দরবারে আসেন না কেন?

আলেম সাহেব বললেন ঃ আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব, তবে তার আগে আমার জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। বাদশা দাম্ভিক ও জালেম প্রকৃতির ছিল বিধায় উক্ত আলেমকে এমন আবেদন করতে হলো। বাদশা বললেন ঃ ঠিক আছে, আপনার জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হলো, আপনি নির্দ্ধিধায় বলতে পারেন।

এবার আলেম দৃঢ় মনোবল নিয়ে বললেন ঃ আমি যদি স্বেচ্ছায় দরবারে না আসি, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন না। আর আমি যদি নিজে আপনার কাছে কিছু না চাই, তাহলে আমার জন্য কিছু পাঠাবেন না। অর্থাৎ আলেম সাহেব কারণ না দর্শিয়ে তাকে না ডাকার আহ্বান জানালেন।

আলেম সাহেবের এমন জবাবে বাদশা ক্ষুদ্ধ হলেন বটে, কিন্তু পূর্ব অঙ্গীকারের কারণে ক্ষোভ সংবরণ করে গেলেন। বুঝে নিলেন, এ আলেমকে কখনো অনুগত করা যাবে না। বস্তুতঃ দুনিয়া বিমুখীতাই আমাদের মর্যাদাশীল জীবন, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও আকশছোঁয়া মনোবল প্রদান করতে পারে।

চার. ইসলাম ও মুসলিমদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস অধ্যায়ন করা

আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অধ্যায়ন করতে হবে। এ অধ্যায়ন নিছক আত্ম-প্রশান্তি লাভের জন্য নয়, বরং ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তেই তারীখ ও সীরাতের গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে কাসীরের (রহ.) "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" একটি অদ্বিতীয় ইতিহাস গ্রন্থ। এটি অধ্যায়ন করলে বিস্ময়কর ঐতিহাসিক কাহিনী, সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তৎপরবর্তী মুসলিমদের উত্থান ও পতনের নির্ভূল বর্ণনা জানা যাবে।

এটি অধ্যায়নে আপনার মানসপটে প্রকৃত মুসলিমের নির্মল প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে এবং আপনার মনে আশার আলো জ্বলে উঠবে।

বর্তমান যুগের মুসলিমদের আচার-আচরণ দিয়ে প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, আমাদের চরিত্র, আমাদের আমল-আখলাক মারাত্মকভাবে ক্রুটিপূর্ণ। এ জন্য আমাদের আমল দিয়ে আসল মুসলিমের অনুসন্ধান না করাই ভাল। কারণ, এতে আপনি নিরাশ হবেন এবং ভাববেন, উম্মতের দায়ী, ইমাম ও আলেমদের যদি এ দুরবস্থা হয়, তাহলে মানুষের সমাজে বাস না করে বন-জঙ্গলে নির্জনবাসই শ্রেয়। অথচ এ ধরণের চিন্তা-ভাবনা মোটেও ঠিক নয় এবং তা অবশ্যই বর্জনীয়। বরং কর্তব্য হলো, ইতিহাস ভালভাবে অধ্যায়ন করে মুসলিমদের শক্তির উৎস খুঁজে বের করা এবং তাদের সার্বিক সংশোধণ, পরিপূর্ণ আমলী যিন্দেগী গঠন ও স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতের দিকে প্রতাবর্তনের পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা। এতে মুসলিমরা হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

পাঁচ. যুব সমাজকে উন্নত চরিত্র ও উঁচু মনোবলের দীক্ষা দান করা

জাতির মেরুদন্ড যুব সমাজকে উন্নত চরিত্র, উচ্চাকাঙ্খা ও বীরত্বের দীক্ষা দিতে হবে। গাফলতীর ঘুম ভেঙ্গে যুবকদেরকে ইসলামী পুনর্জাগরণের সব চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে উঁচু মনোবল ও বীরত্বের শিক্ষা দিতেন। সে সঙ্গে যে সকল কাজের দ্বারা হীনমন্যতা দূরিভূত হয়ে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, সে সব কাজে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমন, তিনি জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য শ্রম-সাধনা ও পরিশ্রম করে রিযিক যোগাড়ের শিক্ষা দিতেন।

কাজেই প্রত্যেকের কর্তব্য হল, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্য সম্ভাব্য সকল বৈষয়িক উপকরণ গ্রহণ করা।[1] এতে শত্রুপক্ষ আমাদের উপর প্রভাব খাটানোর সুযোগ পাবে না। উপরন্তু মুসলিমরা যে কোন বাতিল অপশক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

---

[1] লেখকের এ বক্তব্যের সমর্থনে আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) এর বাস্তবধর্মী একটি সুন্দর বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি সূরা বাকারার ১১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ঈমান ও নেক আমলের পাশাপাশি জাগতিক উন্নতির জন্য বৈষয়িক আসবাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে লিখেন ঃ

"মুসলিমদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফিরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরনতঃ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ঔষধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনি ভাবে কেউ ওষধুপথ্য ব্যবহার করেই ব্যবসায়ে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফিরদের পার্থিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলিমদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয়। বরং কাফিররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করেছে; ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদের মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকতো এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধানা না করত তাহলে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারতো না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবে?

ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী নয়।

"এ কথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলিম যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে তাহলে সেও জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

"এতে প্রতিয়মান হয় যে, জগতে আমাদের দারিদ্র, পরমুখাপেক্ষিতা, বিপদাপদ ও সংকট ইসলামের কারণে নয়, বরং এগুলো একদিকে ইসলামী চরিত্র ও কর্মকান্ড পরিহার করার এবং অন্য দিকে ঐ সমস্ত তৎপরতা থেকে বিমুখিতার পরিণতি, যদ্দারা আর্থিক প্রাচুর্য অর্জিত হয়ে থাকে।

"পরিতাপের বিষয়, ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার সুবাদে আমরা তাদের কাছ থেকে শুধু কুফর, পরকালের প্রতি উদাসীনতা, নির্লজ্জতা, অসচ্চরিত্রতা প্রভৃতি ঠিকই শিখে নিয়েছি, কিন্তু তাদের ঐসব কর্মকান্ড শিক্ষা করিনি যদ্দারা তারা জগতে সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, লেনদেনে সততা, জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শিক্ষা ছিল। কিন্তু আমরা তাদের দেখেও তার অনুকরণের চেষ্টা করিনি। এমতাবস্থায় দোষ ইসলামের, না আমাদের?

"মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল লাভ করা যায় না। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন (বাংলা) ঃ ১/৩৩৯-৩৪০) (অনুবাদক)।

এখানে (লন্ডন) বহু মুসলিম রয়েছে, যারা জীবনের অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রীয় ভাতার উপর নির্ভর করে চলে। এদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কোন ফিকির নেই, যার কারণে এরা সরকারের কোন ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। সর্ব ক্ষেত্রেই এদেরকে সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। কারণ, প্রতিবাদ করলে যে রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তাদের জীবন বাঁচানোই মুশকিল হয়ে পড়বে।

কিন্তু এখানকার মুসলিমগণ ইচ্ছা করলে অর্থোপার্জনের বহু ক্ষেত্র যেমন মিল, ফ্যাক্টরী ইত্যাতি প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। এতে তারা পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানিমুক্ত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতো এবং এমন শক্তি সহস ক্ষমতার অধিকারী হতো যে, তারা সর্ব ক্ষেত্রেই কুফরী শক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হতো।

এ কথা চিরসত্য যে কর্ম-বিমুখিতাই হল পরমুখাপেক্ষিতার প্রধান কারণ। আর মুখাপেক্ষিতা হীনমন্যতার শীর্ষ উপকরণ। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্মে অবহেলা ও অলসতাকে সর্বদা অপছন্দ করতেন। তাই উম্মতকে এসব মন্দ স্বভাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিম্নোক্ত দুআ দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন ঃ

اللهم إنى أعوذبك من الهم والحزن وأعوذبك من العجز والكسل وأعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানী হতে আপনার আশ্রয় চাই। আরও আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, ঋণবৃদ্ধি ও মানুষের অযাচিত প্রভাব থেকে। (বুখারী ঃ ২/৯৪১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআ এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, পেরেশানী মানুষের সৎ চিন্তাকে নষ্ট করে দেয়। অকর্মণ্যতা, অলসতা ও ঋণবৃদ্ধি মানুষকে অপরের গোলামে পরিণত করে। এজন্য এগুলো হতে বেঁচে থাকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা কর্তব্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী মুসলিমের প্রসংশা করে ইরশাদ করেছেন ঃ

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير

“সবল মু‘মিন দুর্বল মু’মিন অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যে কল্যাণ নিহিত।”

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل.

"তোমরা কল্যাণকর বিষয়ের কামনা করবে। কোন কাজে অক্ষমতা প্রকাশ না করে আল্লাহর সাহায নিয়ে তা অব্যাহত রাখবে। কখনো কোন মুসিবতে নিপতিত হলে হতাশ হয়ে এমন বলবে না যে, হায়! যদি এমন না করে অমন করতাম, তাহলে এ মুসিবতে পড়তে হতো না। বরং বলবে ঃ

قدر الله ما شاء الله فعل

"এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।" (মুসলিম ঃ ২/৩৩৮)

সুতরাং কখনো বিপদগ্রস্ত হলে হাতাশ না হয়ে দৃঢ় সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সচেষ্ট হবে। কেননা হতাশ হয়ে নিজের কাজে নিজেকে তিরস্কৃত করতে থাকলে পরিণাম আরও মন্দ হবে।

এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের সৎ সাহস ও দৃঢ় মনোবল থাকা চাই। কখনো ভুলক্রমে কোন অঘটন ঘটে গেলে কিংবা কোন সমস্যা দেখা দিলে যেন এই মনোভাব নিয়ে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে যে, এটাতো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য অবধারিত, তিনি যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন। এ অঘটন ও সমসা সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই, অতএব, হতাশ হওয়ারও কোন কারণ নেই। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ঃ

لوم النفس يورث الاكتئاب

অর্থাৎ আত্ম ভর্ৎসনা নৈরাশ্য টেনে আনে।

এজন্য হাতাশ না হয়ে নব উদ্যমে কাজ করে যাওয়া এবং ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ যদি সূচনাতেই নিজেকে তিরস্কার করে, তাহলে পরিণতিতে সে ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় নিপতিত হবে। কারণ, কোন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করলে যেমন সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, তদ্রুপ নিজের মনকে তিরস্কৃত করলে সেও দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মভর্ৎসনা করতে নিষেধ করেছেন এবং বিপদ বা কোন সমস্যা দেখা দিলেন-

قدر الله وما شاء الله فعل

"এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।" কিংবা

حسبنا الله ونعم الوكيل

"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক"

বলে নব উৎসাহে কাজ শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাক্য দু'টি বলতে নির্দেশ দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিপদে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। নব উদ্দীপনায় কাজ চালিয়ে যাওয়া চাই। কারণ কাজে সাহায্য ও সফলতার জন্য তো আল্লাহ তাআলাই রয়েছেন। তিনি আমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل.

"ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজে অক্ষমতা পকাশ করাকে আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। এজন্য তোমাকে 'কাইস' كيس বা কর্মন্যতা অর্জন করতে হবে। আর যখন অনভিপ্রেত কিছু ঘটে যায় তখন নৈরাশ্য প্রকাশ না করে বলবে حسبي الله ونعم الوكيل (আবু দাউদ ঃ ৫/১১)

অর্থৎ কোন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কিংবা কোন সমস্যা দেখা দিলে মোটেই হতাশ হবে না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করে মনকে এ বলে সান্তনা দিবে যে, "আল্লাহই আমার উত্তম অভিভাবক, তিনিই আমার সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। "অতঃপর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নব উদ্দীপনায় সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকবে।

উপরোক্ত হাদীসে 'অক্ষমতার' বিপরীতে 'কর্মণ্যতা' বুঝাতে 'কাইস' كيس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিকভাবে শব্দটি ক্ষিপ্রতা, মেধার প্রখরতা, সক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে হিসাবে হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, তোমার কর্তব্য হলো কাজে-কর্মে উৎসাহী, ক্ষিপ্র হবে, তখন মনকে এই বলে সান্তনা দিবে যে, "আল্লাহই সর্বোত্তম অভিভাবক এবং তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট"। হীনমন্য হয়ে পিছু হটবে না, বরং সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হবে এবং নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে।

ছয়. হতাশা ও হতাশাবদীদের থেকে দূরে থাকা

আমাদেরকে অবশ্যই হতাশা ও হতাশাবাদীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ভবিষ্যত একমাত্র ইসলামেরই। এটাই আল্লাহর অঙ্গীকার। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্যা হাদীসে আল্লাহর এ অঙ্গীকার তথা ইসলামের বিজয়ের সু-সংবাদ

সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। মুসলিমদের বর্তমান অবস্থাও প্রমাণ করছে যে, সেই শুভক্ষণ সন্নিকটে। তারা অতি দ্রুত সেই সোনালী যুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًاوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে- যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। (সূরা নূর ঃ ৫৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে শর্তারোপ করেছেন ঈমান ও সৎ-কর্মপরায়নতার। কাজেই এ শর্ত দু'টি পূরণ না করলে উক্ত শুভ সংবাদের অধিকারী হওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন ঃ

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقاتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.

"কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। মুসলিমরা এত বীর-বিক্রমে লড়াই করবে যে, ইয়াহুদীরা পালিয়ে পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিবে। আর তখন পাথর ও বৃক্ষ চিৎকার করে বলবে ঃ হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই দেখ, আমার পিছনে ইয়াহুদী! এসো, এদের হত্যা কর! কিন্তু 'গারক্বাদ' غرقد বৃক্ষ এমন আহ্বান জানাবে না। কারণ এটি ইয়াহুদীরেদ গাছ। (মুসলিম ঃ ২/৩৯৬)

এটা সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসে বর্ণিত সময়কাল এখনও অতিবাহিত হয়নি। তাই বলছি, ভবিষ্যত একমাত্র আমাদের। সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها.. الحديث.

"আল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে উপস্থিত করে, তখন আমি পৃথিবীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অবলোকন করি। আমার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত অবশ্যই আমার উম্মতের শাসন কর্তৃত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে... (মুসলিম : ২/৩৯০)

এ হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, অচিরেই মুসলিম উম্মাহর কর্তৃত্ব সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করবে। কেননা বর্ণিত হাদীসে "যতদূর" বলতে সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী মুসলিমদের করতলে আসেনি। সুতরাং আমরা দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে মুসলিমদের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ। অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أن بذل ذليل عزا يعزالله به الإسلام زذلا يذل به الكفر.

"দিন রাতের আবর্তন যে পর্যন্ত রয়েছে, ইসলাম ধর্ম সে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। কাঁচা-পাকা কোন ঘরই অবশিষ্ট থাকবে না। সম্মানিতকে সম্মান দিয়ে আর অপদস্তকে অপমানিত করে এ দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা করবেন। ইসলামকে করবেন সম্মানিত, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত। (মুসনাদে আহমদ ঃ ৪/১০৩) হাদিসটি মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন এবং শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت.

“নবুওয়াত ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে ততদিন থাকবে, যতদিন আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেন। অতঃপর যখন ইচ্ছা, তখন তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর তোমাদের মাঝে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং তা আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর হানাহানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা আল্লাহ তাআলার যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তার বিলুপ্তি ঘটবে। তারপর জবর দখল তথা আধিপত্য বিস্তারের রাজত্ব কায়েম হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়াতে কিছুকাল বিরাজমান থাকবে। তারপর যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, তখন এরও অবসান ঘটবে। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হবে। এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন। (মুসনাদে আহমদঃ ৪/২৭৩)

ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিই প্রমাণ করে সারা বিশ্বে ইসলামী শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজত্বের লাগাম মুসলিমদের হস্তগত হবে। কখনো এর ব্যতিক্রম হবে না। কারণ, বিভিন্ন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা যথা সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন এক হাদীসে আবি কাবিল (রহ.) বলেন ঃ

كنا عند عبد الله بن عمر وبن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا الفسطنطينية ام رومية، فدعى عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسو الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم رومية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل أولا - يعنى الفسطنطينية.

“একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি পশ্ন করল, কোন শহর সর্বপ্রথম বিজিত হবে, কন্সটান্টিনোপল না রোম? আব্দুল্লাহ রা. একটি কড়া বিশিষ্ট বাক্স উপস্থিত করলেন এবং তা থেকে একখানা লিখিত পত্র বের করে বললেন, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে লিখছিলাম। ইতিমধ্যে প্রশ্ন করা হল, সর্ব প্রথম কোন শহর বিজয় হবে, কন্সটান্টিনোপল না রোম? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেব, সর্ব প্রথম হিরাক্লিয়াসের রাজ্য (কন্সটান্টিনোপল) বিজিত হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ২/১৭৬)

এ হাদীস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. রেওয়াতে করেন এবং শায়খ আলবানী রহ. বিশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেন। এই হাদীসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পরিবর্তিতে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত সকল ভবিষ্যদ্বাণী চিরসত্য হিসাবে প্রমাণিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এটাই আমাদের ঈমান ও একীন।

একটি সন্দেহের নিরসন

দুর্বল ঈমানের এক শেণীর মুসলিমের ধারণা পৃথিবীতে আর কখনো পুর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা নিজেদের এ সংশয় ও ভুল ধারণার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআানের এ আয়াত পেশ করেন ঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা তাওবা : ৩৩)

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের মতে এ আয়াতের উদ্যেশ্য ও প্রতিশ্রুতি ইসলামী খেলাফত কায়েম সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

এদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ ধারণার অসারতা প্রমানের জন্য আয়েশা রা. এর এই হাদীসটিই যথেষ্ট যে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزي فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لاظن حين أنزل الله (هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) إن ذالك تما- أى ان ذلك قد تم قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ... الحديث.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'দিবা রাত্রির অবসান ঘটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় 'লাত' উজ্জার পুজা করা না হবে। (আয়েশা (রা.) আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ। সূরায়ে তাওবার এ আয়াত ঃ هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق নাযিল হওয়ার পর মনে করতাম এ আয়াতের প্রতিশ্রুত ইসলামের বিজয় সম্পন্ন হয়েছে, আর কখনো এর পরিবর্তন হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এমন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় এর পরিবর্তন ঘটবে। (মুসনাদে আহমদ ঃ ৫/২৭৮)

অর্থাৎ এক সময় কুফর শিরকের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। তারপর আবারো ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার মাধ্যমে উক্ত আয়াতের পুনঃ বাস্তবায়ন ঘটবে। এ

হাদীসটি এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, সংশয়বাদীদের সংশয় ভিত্তিহীন ও অমূলক। পৃথিবীতে আবারো ইসলামের বিজয় হবে। মুসলিমদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনই প্রমাণ করে যে, অচিরেই বিশ্বে খালেস ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সুতরাং সংশয়ের কোন কারণ নেই।

সময় সংকীর্ণ, নতুবা আমি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতাম যে, বর্তমান পরিস্থিতির আলোকেও বুঝা যায়- ভবিষ্যত কেবল ইসলামরেই। আমরা আশাবাদী যে, অচিরেই উম্মতের উপর আল্লাহর নুসরাত নাযিল হবে। আল্লাহর দরবারে আমাদের আকুতি, তিনি যেন আমাদেরকে হতাশা ও হতাশাবাদীদের থেকে দূরে রাখেন এবং আমাদেরকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যে মনোবল আমাদেরকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিবে, কখনো পিছপা হতে দিবেনা। আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى إله وصحبه وسلم.